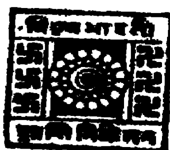
পূরবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ ভাদ্র ১৩৩৮
পুনর্মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৪৯। পুনর্মুদ্রণ আষাঢ় ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ কার্তিক ১৩৫২

রবি ও সাবিনয় দেবীকে —
ওদের জীবনের পরম মুহূর্তে,
প্রীতি ও শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ
এই পুস্তকটী অর্পণ করলাম।

শ্রীবিভূতি ঘোষ। —

উৎসর্গ

বিজয়ার করকমলে

সূচীপত্র

পূরবী

পথিক

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রথম ছত্রের সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

প্রথম ছত্রের সূচী

পূরবী

পূরবী

যারা আমার সাঁজ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে, এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা, সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের 'পরে আমার প্রাণের ঝরনা নিল তুলি,
তাদের সাথে একটি ধারায় মিলিয়ে চলে, সেই তো আমার আয়ু;
নাই সে কেবল দিনগণনার পাঁজির পাতায়, নয় সে নিশাসবায়ু।
তাদের বাঁচায় আমার বাঁচা আপন সীমা ছাড়ায় বহু দূরে;
নিমেষগুলির ফল পেকে যায় নানা দিনের সুধার রসে পুরে;
অতীত কালের আনন্দরূপ বর্তমানের বৃন্তদোলায় দোলে—
গর্ভ হতে মুক্ত শিশু তবুও যেন মায়ের বক্ষে কোলে
বন্দী থাকে নিবিড় প্রেমের বাঁধন দিয়ে। তাই তো যখন শেষে
একে একে আপন জনে সূর্য-আলোর অন্তরালের দেশে
আঁখির নাগাল এড়িয়ে পালায়, তখন রিক্ত শীর্ণ জীবন মম
শুষ্ক রেখায় মিলিয়ে আসে বর্ষাশেষের নির্ঝরিণীসম
শূন্য বালুর একটি প্রান্তে ক্লান্ত বারি স্রস্ত অবহেলায়।
তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্ণবেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে নে ভাই, "এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ তরুর সনে।
এই ভালো রে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।"

বিজয়ী

তখন তারা দৃপ্ত বেগের বিজয়রথে
ছুটছিল বীর মত্ত অধীর রক্তধূলির পথবিপথে।
তখন তাদের চতুর্দিকেই রাত্রিবেলার প্রহর যত
স্বপ্নে-চলার পথিক-মতো
মন্দগমন ছন্দে লুটায় মন্থর কোন্ ক্লান্ত বায়ে ;
বিহঙ্গগান শান্ত তখন অন্ধ রাতের পক্ষছায়ে।

মশাল তাদের রুদ্রজ্বালায় উঠল জ্বলে—
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে ;
দূর-গগনের স্তব্ধ তারা মুগ্ধ ভ্রমর তাহার 'পরে।
ভাবল পথিক, এই যে তাদের মশালশিখা
নয় সে কেবল দণ্ডপলের মরীচিকা।

ভাবল তারা, এই শিখাটাই ধ্রুবজ্যোতির তারার সাথে
মৃত্যুহীনের দখিন হাতে
জ্বলবে বিপুল বিশ্বতলে।
ভাবল তারা, এই শিখারই ভীষণ বলে
রাত্রি-রানীর দুর্গপ্রাচীর দগ্ধ হবে,
অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট দীর্ণ করে ছিনিয়ে লবে
নিত্যকালের বিত্তরাশি ;
ধরিত্রীকে করবে আপন ভোগের দাসী।

ঐ বাজে রে ঘণ্টা বাজে।
চমকে উঠেই হঠাৎ দেখে অন্ধ ছিল তন্দ্রা-মাঝে।
আপ্নাকে হায় দেখছিল কোন্ স্বপ্নাবেশে
যক্ষপুরীর সিংহাসনে লক্ষমণির রাজার বেশে ;
মহেশ্বরের বিশ্ব যেন লুঠ করেছে অট্ট হেসে।

পূরবী

শূন্যে নবীন সূর্য জাগে।
ঐ যে তাহার বিশ্বচেতন কেতন-আগে
জ্বলছে নূতন দীপ্তিরতন তিমিরমথন শুভ্ররাগে ;
মশালভস্ম লুপ্তিধুলায় নিত্যদিনের সুপ্তি মাগে।
আনন্দলোক দ্বার খুলেছে, আকাশ পুলকময়—
জয় ভূলোকের, জয় দ্যুলোকের, জয় আলোকের জয়

মাটির ডাক

১

শালবনের ঐ আঁচল ব্যেপে
যেদিন হাওয়া উঠত খেপে
ফাগুন-বেলার বিপুল ব্যাকুলতায়,
যেদিন দিকে দিগন্তরে
লাগত পুলক কী মন্তরে
কচি পাতার প্রথম কলকথায়,
সেদিন মনে হত কেন
ঐ ভাষারি বাণী যেন
লুকিয়ে আছে হৃদয়কুঞ্জছায়ে ;
তাই অমনি নবীন রাগে
কিশলয়ের সাড়া লাগে
শিউরে-ওঠা আমার সারা গায়ে।
আবার যেদিন আশ্বিনেতে
নদীর ধারে ফসল-খেতে
সূর্য-ওঠার রাঙা রঙিন বেলায়
নীল আকাশের কূলে কূলে
সবুজ সাগর উঠত দুলে
কচি ধানের খামখেয়ালি খেলায়—
সেদিন আমার হ'ত মনে,
ঐ সবুজের নিমন্ত্রণে
যেন আমার প্রাণের আছে দাবি ;
তাই তো হিয়া ছুটে পালায়
যেতে তারি যজ্ঞশালায়,
কোন্ ভুলে হায় হারিয়েছিল চাবি।

পূরবী

২

কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,—
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
"যে জননীর কোলের 'পরে
জন্মেছিলি মর্ত্য-ঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে,
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে।
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।"
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা—
তাই বাজে কার করুণ সুরে
"গেছিস দূরে অনেক দূরে",
কী যেন তাই চোখের 'পরে ঢাকা।
তাই এতদিন সকলখানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে;
ফিরেছি তাই নানামতে,
নানান হাটে, নানান পথে
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

৩

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে-ভরা শোভার নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণদেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে
প্রভাতরবির শঙ্খ বাজে,
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে ;
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্তমনে ক্লান্ত দিনের শেষে।
হেথা হতে গেলেম দূরে
কোথা যে ইঁটকাঠের পুরে
বেড়া-ঘেরা বিষম নির্বাসনে ;
তৃপ্তি যে নাই, কেবল নেশা,
ঠেলাঠেলি, নাই তো মেশা,
আবর্জনা জমে উপার্জনে।
যন্ত্র-জাঁতায় পরান কাঁদায়,
ফিরি ধনের গোলকধাঁধায়,
শূন্যতারে সাজাই নানা সাজে ;
পথ বেড়ে যায় ঘুরে ঘুরে,
লক্ষ্য কোথায় পালায় দূরে,
কাজ ফলে না অবকাশের মাঝে।

৪

যাই ফিরে যাই মাটির বুকে,
যাই চলে যাই মুক্তিসুখে,
ইঁটের শিকল দিই ফেলে দিই টুটে ;
আজ ধরণী আপন হাতে
অন্ন দিলেন আমার পাতে,
ফল দিয়েছেন সাজিয়ে পত্রপুটে।
আজকে মাঠের ঘাসে ঘাসে
নিশ্বাসে মোর খবর আসে
কোথায় আছে বিশ্বজনের প্রাণ ;
ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায়,
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।
যে দূতগুলি গগনপারের
আমার ঘরের রুদ্ধ দ্বারের
বাইরে দিয়েই ফিরে ফিরে যায়,
আজ হয়েছে খোলাখুলি
তাদের সাথে কোলাকুলি
মাঠের ধারে পথতরুর ছায়।
কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এতদিন ;
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।

২৩ ফাল্গুন, ১৩২৮

পঁচিশে বৈশাখ

রাত্রি হল ভোর।
আজি মোর
জন্মের স্মরণপূর্ণ বাণী,
প্রভাতের রৌদ্রে-লেখা লিপিখানি
হাতে করে আনি
দ্বারে আসি দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

দিগন্তে আরক্ত রবি ;
অরণ্যের ম্লান ছায়া বাজে যেন বিষণ্ণ ভৈরবী।
শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যানভঙ্গ করে।
রক্তপথ শুষ্ক মাঠে,
যেন তিলকের রেখা সন্ন্যাসীর উদার ললাটে।

এই দিন বৎসরে বৎসরে
নানা বেশে ফিরে আসে ধরণীর 'পরে—
আতাম্র আম্রের বনে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে,
তরুণ তালের গুচ্ছে নাড়া দিয়ে,
মধ্যদিনে অকস্মাৎ শুষ্কপত্রে তাড়া দিয়ে,
কখনো বা আপনারে ছাড়া দিয়ে
কালবৈশাখীর মত্ত মেঘে
বন্ধহীন বেগে।
আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে

পূরবী

পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে-সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।

এই দিন এল আজ প্রাতে
যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে
তাহার নির্ঘোষ বাজে
ঘন ঘন মোর বক্ষ-মাঝে।
জন্মমরণের
দিগ্বলয়-চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলালো।
শুভ্র আলো
কালের বাঁশরি হতে উচ্ছ্বসি যেন রে
শূন্য দিল ভরে।
আলোকের অসীম সংগীতে
চিত্ত মোর ঝংকারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।

উদয়-দিক্‌প্রান্ততলে নেমে এসে
শান্ত হেসে
এই দিন বলে আজি মোর কানে,
"অম্লান নূতন হয়ে অসংখ্যের মাঝখানে
একদিন তুমি এসেছিলে
এ নিখিলে—
নবমল্লিকার গন্ধে,
সপ্তপর্ণপল্লবের পবনহিল্লোল-দোল-ছন্দে,

শ্যামলের বুকে,
নির্নিমেষ নীলিমার নয়নসম্মুখে।
সেই যে নূতন তুমি,
তোমারে ললাট চুমি
এসেছি জাগাতে
বৈশাখের উদ্দীপ্ত প্রভাতে।

হে নূতন,
দেখা দিক্‌ আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।
আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি
শীর্ণ নিমেষের যত ধূলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।
মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
ক্ষয়হীন—
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে,
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।
হে নূতন,
হোক তব জাগরণ
ভস্ম হতে দীপ্ত হুতাশন।

হে নূতন,
তোমার প্রকাশ হোক কুজ্ঝটিকা করি উদ্‌ঘাটন
সূর্যের মতন।
বসন্তের জয়ধ্বজা ধরি
শূন্য শাখে কিশলয় মুহূর্তে অরণ্য দেয় ভরি—

সেইমতো, হে নূতন,
রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমা-মাঝে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময়।"

উদয়-দিগন্তে ঐ শুভ্র শঙ্খ বাজে।
মোর চিত্ত-মাঝে
চির-নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

২৫ বৈশাখ, ১৩২৯

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবে না সাড়া তারে
তোমার নবীন ছন্দে? আজিকার কাজরি গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায়;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে-বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলি-'পরে।
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্লরাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা; কবি, আজ হতে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্যকক্ষে তোমারে না দেখি
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশিরসিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরবসংগীত তব দ্বারে।

জানি, তুমি প্রাণ খুলি
এ সুন্দরী ধরণীরে ভালোবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সংগীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার 'পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্রবেগে অর্জুনের অগ্নিবাণসম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্মল, নির্মম,
করুণ, কোমল। তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রী-'পরে
একটি অপূর্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে-তন্ত্র হয়েছে বাঁধা; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কথনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,

কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গনতলে
বর্ষাবসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়েছ সংগীত তব ; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেছ আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রীদল রুদ্ধদ্বার রাত্রি-অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব নব সংকটের পথে পথে, তাহাদের লাগি
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি
জয়মাল্য বিরচিয়া— রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানাসূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারি।

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে গেলে দান
দূরকালে ; তাহাদের কাছে তুমি নিত্য-গাওয়া গান
মূর্তিহীন। কিন্তু, যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারালো তার সন্ধান কোথায়,
কোথায় সান্ত্বনা। বন্ধুমিলনের দিনে বারম্বার
উৎসবরসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হতে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে— অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া

করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,— আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য-বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে। সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রু-সাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গলবারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধুপারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারিগানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক— সূর্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুনঃ আজ তার সাথে দেখা
মেঘে-ভরা বৃষ্টিঝরা দিনে। সেই মোরে দিল আনি
ঝরে-পড়া কদম্বের কেশরসুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ-বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি ওই খেয়া-'পরে করি ভর,

না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে ;
দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখি-জাগা বসন্তপ্রভাতে ;
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণদিনে ; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র-সঘন সন্ধ্যায় ; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথরাত্রে ; হেমন্তের দিনান্তবেলায়
কুহেলিগুণ্ঠনতলে।

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন-মনে ; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে, দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে ; ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি, সর্ব আবরণ করি লীন
চিরন্তন হলে তুমি, মর্ত্যকবি, মুহূর্তের মাঝে।
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সংগীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার ; যদি কভু দেখা হয়
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়—
কোন্ ছন্দে, কোন্ রূপে। যেমনি অপূর্ব হোক-নাকো
তবু আশা করি, যেন মনের একটি কোণে রাখ
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুঃখে সুখে
বিজড়িত ; আশা করি, মর্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্যলোকের দ্বারে— ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।

আষাঢ়, ১৩২৯

শিলঙের চিঠি

শ্রীমতী শোভনা দেবী ও শ্রীমতী নলিনী দেবী কল্যাণীয়াসু

ছন্দে-লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে—
ভাবছি বসে, এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে।
তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ অভ্যাস ;
মনে ছিল, হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস ;
কিছু না হোক, 'লঙ্‌ফেলো'দের হব আমি সমান তো—
এখন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।
এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ,
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে পড়ে সদা চিৎ।
যা হোক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরি সে,
শক্তি এখন কম পড়েছে তাই হয়েছে বৈরী সে ;
সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো,
নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো।
তাই বসেছি ডেস্কে আমার, ডাক দিয়েছি চাকরকে,—
"কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালি লে আও ধাঁ করকে।"
ভাবছি, যদি তোমরা দুজন বছর তিরিশ পূর্বেতে
গরজ করে আসতে কাছে, কিছু তবু সুর পেতে।
সেদিন যখন আজকে দিনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক,
বর্তমানের সুবুদ্ধিরা প্রায় ছিল সব হাবা লোক,
তখন যদি বলতে আমায় লিখতে পয়ার মিল করে
লাইনগুলো পোকার মতো বেরোত পিল্‌পিল্ করে।
পঞ্জিকাটা মান নাকি, দিন দেখাটায় লক্ষ্য নেই ?
লগ্নটি সব বইয়ে দিয়ে আজ এসেছ অক্ষণেই।
যা হোক তবু যা পারি তাই জুড়ব কথা ছন্দেতে,
কবিত্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্কন্ধেতে।
শিলংগিরির বর্ণনা চাও ? আচ্ছা না-হয় তাই হবে,
উচ্চদরের কাব্যকলা না যদি হয় নাই হবে—

মিল বাঁচাব, মেনে যাব মাত্রা দেবার বিধান তো ;
তার বেশি আর করলে আশা ঠকবে এবার নিতান্ত।

গর্মি যখন ছুটল না আর পাখার হাওয়ায় শরবতে,
ঠাণ্ডা হতে দৌড়ে এলুম শিলঙ-নামক পর্বতে।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহনছায়া অরণ্যে
ক্লান্তজনে ডাক দিয়ে কয়, "কোলে আমার শরণ নে।"
ঝরনা ঝরে কল্‌কলিয়ে আঁকা-বাঁকা ভঙ্গিতে,
বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সংগীতে।
বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন-বনের পল্লবে,
নিশ্বাসে তার বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে।
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে,
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে
দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত ;
মোদের 'পরে বাদল-মেঘের নেই ততদূর দৃষ্টিপাত।

এখানে খুব লাগল ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই হাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয়
বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল তুলি ;
নাম-না-জানা পাখি নাচে, শিষ দিয়ে যায় বুলবুলি।
ভালো লাগে দুপুরবেলায় মন্দমধুর ঠাণ্ডাটি,
ভোলায় রে মন দেবদারুবন গিরিদেবের পাণ্ডাটি।
ভালো লাগে আলোছায়ার নানারকম আঁক কাটা,
দিব্যি দেখায় শৈলবুকে শস্যখেতের থাক কাটা।
ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দিতে,
রবির সাথে ইন্দ্র মেলেন নীল-সোনালির সন্ধিতে।

নয় ভালো এই গুর্খাদলের কুচ্‌কাওয়াজের কাণ্ডটা,
তা ছাড়া ঐ ব্যাগ্রপাইপ-নামক বাদ্যভাণ্ডটা।
ঘন ঘন বাজায় শিঙা— আকাশ করে সরগরম ;
গুলিগোলার ধড়্‌ধড়ানি, বুকের মধ্যে থর্‌থরম্‌।
আর ভালো নয় মোটরগাড়ির ঘোর বেসুরো হাঁক দেওয়া,
নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাঁক দেওয়া।
তা ছাড়া সব পিসু মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি,
কখনো বা খাওয়ার দোষে রুখে দাঁড়ায় পিত্তাদি—
এমনতরো ছোটোখাটো একটা কিম্বা অর্ধটা
যৎসামান্য উপদ্রবের নাই বা দিলাম ফর্দটা।
দোষ গাইতে চাই যদি তো তাল করা যায় বিন্দুকে ;
মোটের উপর শিলঙ ভালোই যাই-না বলুক নিন্দুকে।
আমার মতে জগৎটাতে ভালোটারই প্রাধান্য—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।
বর্ণনাটা ক্ষান্ত করি, অনেকগুলো কাজ বাকি ;
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।

ছড়া কিম্বা কাব্য কভু লিখবে পরের ফরমাশে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জেনো, নয়কো তেমন শর্মা সে।
তথাপি এই ছন্দ রচে করেছি কাল নষ্ট তো ;
এইখানেতে কারণটি তার বলে রাখি স্পষ্টত—
তোমরা দুজন বয়সেতে ছোটোই হবে বোধ করি,
আর আমি তো পরমায়ুর ষাট দিয়েছি শোধ করি।
তবু আমার পক্ক-কেশের লম্বা-দাড়ির সম্ভ্রমে
আমাকে যে ভয় কর নি দুর্বাসা কি যম-ভ্রমে,
মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখতে চিঠি হুকুম এল লম্ফিত—

এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হল উৎসাহে,
মনে হল— বৃদ্ধ আমি, মন্দ লোকের কুৎসা এ।
মনে হল, আজো আছে কম বয়সের রঙ্গিমা,
জরার কোপে দাড়িগোঁপে হয় নি জবড়জঙ্গিমা।
তাই বুঝি সব ছোটো যারা তারা যে কোন্ বিশ্বাসে
একবয়সি বলে আমায় চিনেছে এক নিশ্বাসে।
এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ আছে—
ডাকছে ভোলা "খাবার এল", আমার কি আর হুঁশ আছে
জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো;
ভুলেই গেলাম লিখতে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।
মনকে ডাকি, "হে আত্মারাম, ছুটুক তোমার কবিত্ব—
ছোট্ট দুটি মেয়ের কাছে ফুটুক রবির রবিত্ব।"

জিৎভূমি, শিলং
২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

যাত্রা

আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলিফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল ; তারা মরণকূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে, "চলো চলো।"
অশ্রুবাষ্পকুহেলিতে দিগন্তের চক্ষু ছলছল,
ধরিত্রীর আর্দ্রবক্ষে তৃণে তৃণে কম্পন সঞ্চারে—
তবু ওই প্রভাতের যাত্রীদল বিদায়ের দ্বারে
হাস্যমুখে ঊর্ধ্ব-পানে চায় ; দেখে, অরুণ আলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংসশুভ্র মেঘের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে।

ওরে, এতক্ষণে বুঝি
তারা-ঝরা নির্ঝরের স্রোতঃপথে পথ খুঁজি খুঁজি
গেছে সাত ভাই, চম্পা ; কেতকীর রেণুতে রেণুতে
ছেয়েছে যাত্রার পথ ; দিগ্‌বধূর বেণুতে বেণুতে
বেজেছে ছুটির গান ; ভাঁটার নদীর ঢেউগুলি
মুক্তির কল্লোলে মাতে, নৃত্যবেগে ঊর্ধ্বে বাহু তুলি
উচ্ছলিয়া বলে, "চলো, চলো।" বাউল উত্তরে-হাওয়া
ধেয়েছে দক্ষিণমুখে মরণের-রুদ্রনেশা-পাওয়া ;
বাজায় অশান্ত ছন্দে তালপল্লবের করতাল,
ফুকারে বৈরাগ্যমন্ত্র ; স্পর্শে তার হয়েছে মাতাল
প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কাশের মঞ্জরী, কাঁপে তারা
ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে— বলে, "বৃন্তবন্ধহারা
যাব উদ্দামের পথে, যাব আনন্দিত সর্বনাশে,
রিক্তবৃষ্টি মেঘ-সাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে ;
যাব যেথা শংকরের টলমল চরণপাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র-মুখরিত তাণ্ডবমাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয়-উজ্জ্বল

আত্মঘাত-মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ।”

ওরা ডেকে বলে, “কবি,
সে তীর্থে কি তুমি সঙ্গে যাবে, যেথা অস্তগামী রবি
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনাসভায়,
যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য, যেথায় নিঃশব্দ বেণু-’পরে
সংগীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে।”

কবি বলে, “যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসবপ্রাঙ্গণে
মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দদীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বরবরমাল্য-সাথে; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গনদ্বারে-প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দনমন্দারগন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকরপাতি
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।

আমি তব সাথি,
হে শেফালি, শরৎ-নিশির স্বপ্ন, শিশিরসিঞ্চিত
প্রভাতের বিচ্ছেদবেদনা— মোর সুচিরসঞ্চিত
অসমাপ্ত সংগীতের ডালিখানি নিয়ে বক্ষতলে,
সমর্পিব নির্বাকের নির্বাণবাণীর হোমানলে।”

আশ্বিন, ১৩৩০

তপোভঙ্গ

যৌবনবেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি,
হে কালের অধীশ্বর, অন্যমনে গিয়েছ কি ভুলি,
হে ভোলা সন্ন্যাসী।
চঞ্চল চৈত্রের রাতে
কিংশুকমঞ্জরী-সাথে
শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি।
আশ্বিনের বৃষ্টিহারা শীর্ণশুভ্র মেঘের ভেলায়
গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায়?

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি।
দস্যু তারা হেসে হেসে
হে ভিক্ষুক, নিল শেষে
তোমার ডম্বরু শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি।
গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদনরসে
ভরি তব কমণ্ডলু নিমজ্জিল নিবিড় আলসে
মাধুর্যরভসে।

সেদিন তপস্যা তব অকস্মাৎ শূন্যে গেল ভেসে
শুষ্কপত্রে ঘূর্ণবেগে গীতরিক্ত হিমমরুদেশে
উত্তরের মুখে।
তব ধ্যানমন্ত্রটিরে
আনিল বাহির-তীরে
পুষ্পগন্ধে লক্ষ্যহারা দক্ষিণের বায়ুর কৌতুকে।

সে-মন্ত্রে উঠিল মাতি সেঁউতি কাঞ্চন করবিকা,
সে-মন্ত্রে নবীনপত্রে জ্বালি দিল অরণ্যবীথিকা
শ্যাম বহ্নিশিখা।

বসন্তের বন্যাস্রোতে সন্ন্যাসের হল অবসান :
জটিল জটার বন্ধে জাহ্নবীর অশ্রুকলতান
শুনিলে তন্ময়।
সেদিন ঐশ্বর্য তব
উন্মেষিল নব নব,
অন্তরে উদ্বেল হল আপনাতে আপন বিস্ময়।
আপনি সন্ধান পেলে আপনার সৌন্দর্য উদার,
আনন্দে ধরিলে হাতে জ্যোতির্ময় পাত্রটি সুধার
বিশ্বের ক্ষুধার।

সেদিন উন্মত্ত তুমি যে-নৃত্যে ফিরিলে বনে বনে
সে-নৃত্যের ছন্দে লয়ে সংগীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে
তব সঙ্গ ধরে।
ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্নচোখে
নিত্যনূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে।
দেখেছিনু, সুন্দরের অন্তর্লীন হাসির রঙ্গিমা—
দেখেছিনু, লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপতরঙ্গিমা।

সেদিনের পানপাত্র, আজ তার ঘুচালে পূর্ণতা ?
মুছিলে চুম্বনরাগে-চিহ্নিত বঙ্কিম রেখালতা
রক্তিম-অঙ্কনে ?

পূরবী

অগীত সংগীতধার,
অশ্রুর সঞ্চয়ভার,
অযত্নে লুণ্ঠিত সে কি ভগ্নভাণ্ডে তোমার অঙ্গনে।
তোমার তাণ্ডবনৃত্যে চূর্ণ চূর্ণ হয়েছে সে ধূলি ?
নিঃস্ব কালবৈশাখীর নিশ্বাসে কি উঠিছে আকুলি
লুপ্ত দিনগুলি।

নহে নহে, আছে তারা ; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সংগোপনে।
তোমার জটায় হারা
গঙ্গা আজ শান্তধারা,
তোমার ললাটে চন্দ্র গুপ্ত আজি সুপ্তির বন্ধনে।
আবার কী লীলাচ্ছলে অকিঞ্চন সেজেছ বাহিরে।
অন্ধকারে নিঃস্বনিছে যত দূরে দিগন্তে চাহি রে—
"নাহি রে, নাহি রে।"

কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিনধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠগৃহ-মাঝে,
উৎকণ্ঠিত বেগে।
নির্জন প্রান্তরতলে
আলেয়ার আলো জ্বলে,
বিদ্যুৎ-বহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।
চঞ্চল মুহূর্ত যত অন্ধকারে দুঃসহ নৈরাশে
নিবিড় নিবদ্ধ হয়ে তপস্যার নিরুদ্ধ নিশ্বাসে
শান্ত হয়ে আসে।

জানি জানি, এ তপস্যা দীর্ঘরাত্রি করিছে সন্ধান
চঞ্চলের নৃত্যস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান
দুরন্ত উল্লাসে।
বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।
বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসননাশন,
বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।

তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী—
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জয়ের জয়মালা
পূর্ণ করে মোর ডালা ;
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।
ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী ;
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহলকোলাহল আনি
মোর গান হানি।

হে শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগি, ছলনা জানি সব—
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব
ছদ্মরণবেশে।
বারে বারে পঞ্চশরে
অগ্নিতেজে দগ্ধ করে
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করি বারে বারে বাঁচাইবে শেষে

বারে বারে তারি তূণ সম্মোহনে ভরি দিব ব'লে
আমি কবি সংগীতের ইন্দ্রজাল নিয়ে আসি চলে
মৃত্তিকার কোলে।

জানি জানি, বারম্বার প্রেয়সীর পীড়িত প্রার্থনা
শুনিয়া জাগিতে চাও আচম্বিতে, ওগো অন্যমনা,
নূতন উৎসাহে।
তাই তুমি ধ্যানচ্ছলে
বিলীন বিরহতলে,
উমাকে কাঁদাতে চাও বিচ্ছেদের দীপ্তদুঃখদাহে।
ভগ্নতপস্যার পরে মিলনের বিচিত্র সে-ছবি
দেখি আমি যুগে যুগে, বীণাতন্ত্রে বাজাই ভৈরবী-
আমি সেই কবি।

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্যবিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাক' বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

ভৈরব, সেদিন তব প্রেতসঙ্গীদল রক্ত-আঁখি
দেখে, তব শুভ্রতনু রক্তাংশুকে রহিয়াছে ঢাকি
প্রাতঃসূর্যরুচি।

অস্থিমালা গেছে খুলে
মাধবীবল্লরীমূলে,
ভালে মাখা পুষ্পরেণু, চিতাভস্ম কোথা গেছে মুছি।
কৌতুকে হাসেন উমা কটাক্ষে লক্ষিয়া কবি-পানে;
সে-হাস্যে মন্দ্রিল বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনিগানে
কবির পরানে।

কার্তিক, ১৩৩০

ভাঙা মন্দির

১

পুণ্যলোভীর নাই হল ভিড়
শূন্য তোমার অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
অর্ঘ্যের আলো নাই বা সাজালো
পুষ্পে প্রদীপে চন্দনে
যাত্রীরা তব বিস্মৃতপরিচয়।
সম্মুখ-পানে দেখো দেখি চেয়ে,
ফাল্গুনে তব প্রাঙ্গণ ছেয়ে
বনফুলদল ঐ এল ধেয়ে
উল্লাসে চারিধারে।
দক্ষিণবায়ে কোন্ আহ্বান
শূন্যে জাগায় বন্দনাগান,
কী খেয়াতরীর পায় সন্ধান
আসে পৃথ্বীর পারে।
গন্ধের থালি, বর্ণের ডালি
আনে নির্জন অঙ্গনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
বকুল শিমুল আকন্দ ফুল
কাঞ্চন জবা রঙ্গনে
পূজাতরঙ্গ দুলে অম্বরময়।

২

প্রতিমা না-হয় হয়েছে চূর্ণ,
বেদীতে না-হয় শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—

না-হয় ধুলায় হল লুণ্ঠিত
আছিল যে-চূড়া উন্নতা,
সজ্জা না থাকে কিসের লজ্জা ভয় ?
বাহিরে তোমার ঐ দেখো ছবি,
ভগ্নভিত্তিলগ্ন মাধবী,
নীলাম্বরের প্রাঙ্গণে রবি
হেরিয়া হাসিছে স্নেহে।
বাতাসে পুলকি আলোকে আকুলি
আন্দোলি উঠে মঞ্জরীগুলি
নবীন প্রাণের হিল্লোল তুলি
প্রাচীন তোমার গেহে।
সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে
ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে
ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য 'জয় জয়'।

সেবার প্রহরে নাই আসিল রে
যত সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
নাই মুখরিল পার্বণ-ক্ষণ
ঘনজনতার গর্জনে,
অতিথিভোগের না রহিল সঞ্চয়-
পূজার মঞ্চে বিহঙ্গদল
কুলায় বাঁধিয়া করে কোলাহল,

তাই তো হেথায় জীববৎসল
আসিছেন ফিরে ফিরে।
নিত্যসেবার পেয়ে আয়োজন
তৃপ্তপরানে করিছে কূজন,
উৎসবরসে সেই তো পূজন
জীবন-উৎসতীরে।
নাইকো দেবতা ভেবে সেই কথা
গেল সন্ন্যাসী-সজ্জনে,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়—
সেই অবকাশে দেবতা যে আসে,
প্রসাদ-অমৃতমজ্জনে
স্খলিত ভিত্তি হল যে পুণ্যময়।

মাঘ, ১৩৩০

আগমনী

মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল, তাহা
বুঝিতে পার তুমি ?
শোন নি কানে, হঠাৎ গানে কহিল "আহা, আহা"
সকল বনভূমি ?
শুষ্ক জরা পুষ্পঝরা,
হিমের বায়ে কাঁপনধরা
শিথিল মন্থর
"কে এল" বলি তরাসি উঠে শীতের সহচর।

গোপনে এল, স্বপনে এল, এল সে মায়াপথে,
পায়ের ধ্বনি নাহি।
ছায়াতে এল, কায়াতে এল, এল সে মনোরথে
দখিনহাওয়া বাহি।
অশোকবনে নবীন পাতা
আকাশ-পানে তুলিল মাথা,
কহিল, "এসেছ কি।"
মর্মরিয়া থরথর কাঁপিল আমলকী।

কাহারে চেয়ে উঠিল গেয়ে দোয়েল চাঁপাশাখে,
"শোনো গো, শোনো শোনো।"
শ্যামা না জানে প্রভাতী গানে কী নামে তারে ডাকে-
আছে কি নাম কোনো।
কোকিল শুধু মুহুর্মুহু
আপন-মনে কুহরে কুহু
ব্যথায় ভরা বাণী।
কপোত বুঝি শুধায় শুধু, "জানি কি, তারে জানি ?"

পূরবী

আমের বোলে কী কলরোলে সুবাস ওঠে মাতি
অসহ উচ্ছ্বাসে।
আপন-মনে মাধবী ভনে কেবলি দিবারাতি,
"মোরে সে ভালোবাসে।"
অধীর হাওয়া নদীর পারে
খেপার মতো কহিছে কারে,
"বলো তো কী যে করি।"
শিহরি উঠি শিরীষ বলে, "কে ডাকে মরি, মরি।"

কেন যে আজি উঠিল বাজি আকাশকাঁদা বাঁশি
জানিস তাহা না কি।
রঙিন যত মেঘের মতো কী যায় মনে ভাসি
কেন যে থাকি থাকি।
অবুঝ তোরা, তাহারে বুঝি
দূরের পানে ফিরিস খুঁজি ;
বাহিরে আঁখি বাঁধা,
প্রাণের মাঝে চাহিস না যে, তাই তো লাগে ধাঁধা।

পুলকে-কাঁপা কনকচাঁপা বুকের মধুকোষে
পেয়েছে দ্বার নাড়া,
এমন ক'রে কুঞ্জ ভ'রে সহজে তাই তো সে
দিয়েছে তারি সাড়া।
সহসা বনমল্লিকা যে
পেয়েছে তারে আপন-মাঝে,
ছুটিয়া দলে দলে
"এই যে তুমি, এই যে তুমি" আঙুল তুলে বলে।

পেয়েছে তারা, গেয়েছে তারা, জেনেছে তারা সব
আপন-মাঝখানে,
তাই এ শীতে জাগালো গীতে বিপুল কলরব
দ্বিধাবিহীন তানে।
ওদের সাথে জাগ্‌ রে কবি,
হৃৎকমলে দেখ্‌ সে ছবি,
ভাঙুক মোহঘোর।
বনের তলে নবীন এল, মনের তলে তোর।

আলোতে তোরে দিক-না ভরে ভোরের নব রবি,
বাজ্‌ রে বীণা বাজ্‌।
গগনকোলে হাওয়ার দোলে ওঠ্‌ রে দুলে কবি,
ফুরালো তোর কাজ।
বিদায় নিয়ে যাবার আগে
পড়ুক টান ভিতর-বাগে,
বাহিরে পাস ছুটি।
প্রেমের ডোরে বাঁধুক তোরে, বাঁধন যাক টুটি।

মাঘ, ১৩৩০

উৎসবের দিন

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে,
মিলনসুখের বক্ষোমাঝে।
আনন্দের হৃৎস্পন্দনে আন্দোলিছে ক্ষণে ক্ষণে
বেদনার রুদ্র দেবতা যে।
তাই আজ উৎসবের ভোরবেলা হতে
বাষ্পাকুল অরুণের করুণ আলোতে
উল্লাসকল্লোলতলে ভৈরবী রাগিণী কেঁদে বাজে
মিলনসুখের বক্ষোমাঝে।

নবীন পল্লবপুটে মর্মরি মর্মরি উঠে
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস ;
উষার সীমন্তে লেখা উদয়সিন্দূররেখা
মনে আনে সন্ধ্যার আকাশ।
আম্রের মুকুলগন্ধে ব্যাকুল কী সুর
অরণ্যছায়ার হিয়া করিছে বিধুর ,
অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস—
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে
এসেছিল সৌভাগ্যলগন।
আশার লাবণ্যে ভরা জেগেছিল বসুন্ধরা,
হেসেছিল প্রভাতগগন।
কত-না উৎসুক-বুকে পথ-পানে ধাওয়া,
কত-না চকিতচক্ষে প্রতীক্ষার চাওয়া
বারে বারে বসন্তেরে করেছিল চাঞ্চল্যে-মগন—
এসেছিল সৌভাগ্যলগন।

আজ উৎসবের সুরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে,
বাতাসেরে করে যে উদাস।
তাদের পরশ পায়, কী মায়াতে ভরে যায়
প্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ॥
তাদের চমক লাগে চম্পকশাখায়,
কাঁপে তারা মৌমাছির গুঞ্জিত পাথায়,
সেতারের তারে তারে মূর্ছনায় তাদের আভাস
বাতাসেরে করিল উদাস।

কালস্রোতে এ অকূলে আলোচ্ছায়া দুলে দুলে
চলে নিত্য অজানার টানে।
বাঁশি কেন রহি রহি সে-আহ্বান আনে বহি
আজি এই উল্লাসের গানে?
চঞ্চলেরে শুনাইছে স্তব্ধতার ভাষা,
যার রাত্রিনীড়ে আসে যত শঙ্কা-আশা।
বাঁশি কেন প্রশ্ন করে, "বিশ্ব কোন্ অনন্তের পানে
চলে নিত্য অজানার টানে।"

যায় যাক, যায় যাক, আসুক দূরের ডাক,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।
চলার সংঘাতবেগে সংগীত উঠুক জেগে
আকাশের হৃদয়নন্দন।
মুহূর্তের নৃত্যচ্ছন্দে ক্ষণিকের দল
যাক পথে মত্ত হয়ে বাজায়ে মাদল;
অনিত্যের স্রোত বেয়ে যাক ভেসে হাসি ও ক্রন্দন,
যাক ছিঁড়ে সকল বন্ধন।

ফাল্গুন, ১৩৩০

গানের সাজি

গানের সাজি এনেছি আজি—
ঢাকাটি তার লও গো খুলে,
দেখো তো চেয়ে কী আছে।
যে থাকে মনে স্বপনবনে
ছায়ার দেশে ভাবের কূলে
সে বুঝি কিছু দিয়াছে।
কী যে সে তাহা আমি কী জানি,
ভাষায় চাপা কোন্ সে বাণী
সুরের ফুলে গন্ধখানি
ছন্দে বাঁধি গিয়াছে—
সে ফুল বুঝি হয়েছে পুঁজি,
দেখো তো চেয়ে কী আছে।

দেখো তো সখী, দিয়েছে ও কি—
সুখের কাঁদা, দুখের হাসি,
দুরাশাভরা চাহনি।
দিয়েছে কি না ভোরের বীণা,
দিয়েছে কি সে রাতের বাঁশি
গহন-গান-গাহনি।
বিপুলব্যথা ফাগুনবেলা,
সোহাগ কভু, কভু বা হেলা,
আপন-মনে আগুনখেলা
পরানমন-দাহনি—
দেখো তো ডালা, সে স্মৃতিঢালা
আছে আকুল চাহনি?

ডেকেছ কবে মধুর রবে,
মিটালে কবে প্রাণের ক্ষুধা
তোমার করপরশে,
সহসা এসে করুণ হেসে
কখন চোখে ঢালিলে সুধা
ক্ষণিক তব দরশে—
বাসনা জাগে নিভৃতে চিতে
সে-সব দান ফিরায়ে দিতে
আমার দিনশেষের গীতে ;
সফল তারে করো-সে।
গানের সাজি খোলো গো আজি
করুণ করপরশে।

রসে বিলীন সে-সব দিন
ভরেছে আজি বরণডালা
চরম তব বরণে।
সুরের ডোরে গাঁথনি ক'রে
রচিয়া মম বিরহমালা
রাখিয়া যাব চরণে।
একদা তব মনে না রবে,
স্বপনে এরা মিলাবে কবে,
তাহারি আগে মরুক তবে
অমৃতময় মরণে
ফাগুনে তোরে বরণ ক'রে
সকল-শেষ বরণে ।

ফাল্গুন, ১৩৩০

লীলাসঙ্গিনী

দুয়ারবাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি—
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলাসঙ্গিনী।
কাজে ফেলে মোরে চলে গেলে কোন্ দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে?
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে—
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল।
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল।
চৈত্রহাওয়ায় উতলা কুঞ্জ-মাঝে
চারুচরণের ছায়ামঞ্জীর বাজে,
সেদিনের তুমি এলে এদিনের সাজে
ওগো চিরচঞ্চল।
অঞ্চল হতে ঝরে বায়ুস্রোতে
সেদিনের পরিমল।

মনে আছে সে কি সব কাজ, সখী,
ভুলায়েছ বারে বারে—
বন্ধ দুয়ার খুলেছ আমার
কঙ্কণঝংকারে।

পূরবী

ইশারা তোমার বাতাসে বাতাসে ভেসে
ঘুরে ঘুরে যেত মোর বাতায়নে এসে
কখনো আমের নবমুকুলের বেশে
কভু নবমেঘভারে।
চকিতে চকিতে চল-চাহনিতে
ভুলায়েছ বারে বারে।

নদীকূলে-কূলে কল্লোল তুলে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।
বনপথে আসি করিতে উদাসি
কেতকীর রেণু মেখে।
বর্ষাশেষের গগনকোনায়-কোনায়
সন্ধ্যামেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়
নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।
কখনো হাসিতে কখনো বাঁশিতে
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।

কী লক্ষ্য নিয়ে এসেছ এ বেলা
কাজের কক্ষকোণে।
সাথি খুঁজিতে কি ফিরিছ একেলা
তব খেলাপ্রাঙ্গণে।
নিয়ে যাবে মোরে নীলাম্বরের তলে
ঘরছাড়া যত দিশাহারাদের দলে—
অযাত্রাপথে যাত্রী যাহারা চলে
নিষ্ফল আয়োজনে ?
কাজ ভোলাবারে ফেরো বারে বারে
কাজের কক্ষকোণে।

পূরবী

আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানসপ্রতিমাগুলি ?
কল্পনাপটে নেশার বরনে
বুলাব রসের তুলি ?
বিবাগি মনের ভাবনা ফাগুনপ্রাতে
উড়ে চলে যাবে উৎসুক বেদনাতে
কলগুঞ্জিত মৌমাছিদের সাথে
পাখায় পুষ্পধূলি।
আবার নিভৃতে হবে কি রচিতে
মানসপ্রতিমাগুলি।

দেখ না কি, হায়, বেলা চলে যায়—
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষরাগিণীর বীন।
এতদিন হেথা ছিনু আমি পরবাসী,
হারিয়ে ফেলেছি সেদিনের সেই বাঁশি,
আজ সন্ধ্যায় প্রাণ ওঠে নিশ্বাসি
গানহারা উদাসীন।
কেন অবেলায় ডেকেছ খেলায়,
সারা হয়ে এল দিন।

এবার কি তবে শেষ খেলা হবে
নিশীথ-অন্ধকারে।
মনে মনে বুঝি হবে খোঁজাখুঁজি
অমাবস্যার পারে ?
মালতীলতায় যাহারে দেখেছি প্রাতে
তারায় তারায় তারি লুকাচুরি রাতে ?

পূরবী

সুর বেজেছিল যাহার পরশপাতে
নীরবে লভিব তারে ?
দিনের দুরাশা স্বপনের ভাষা
রচিবে অন্ধকারে ?

যদি রাত হয় না করিব ভয়—
চিনি যে তোমারে চিনি।
চোখে নাই দেখি তবু ছলিবে কি,
হে গোপনরঙ্গিণী।
নিমেষে আঁচল ছুঁয়ে যায় যদি চলে
তবু সব কথা যাবে সে আমায় বলে,
তিমিরে তোমার পরশলহরী দোলে,
হে রসতরঙ্গিণী।
হে আমার প্রিয়, আবার ভুলিয়ো,
চিনি যে তোমারে চিনি।

ফাল্গুন, ১৩৩০

শেষ অর্ঘ্য

যে-তারা মহেন্দ্রক্ষণে প্রত্যূষবেলায়
প্রথম শুনালো মোরে নিশান্তের বাণী
শান্তমুখে ; নিখিলের আনন্দমেলায়
স্নিগ্ধকণ্ঠে ডেকে নিয়ে এল ; দিল আনি
ইন্দ্রাণীর হাসিখানি দিনের খেলায়
প্রাণের প্রাঙ্গণে ; যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলিপাতে তন্দ্রাযবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়ালো পরশমণি জ্যোতির কণিকা ;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা ;
এ সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে,
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

বেঠিক পথের পথিক

বেঠিক পথের পথিক আমার
অচিন সে জন রে।
চকিত চলার ক্বচিৎ হাওয়ায়
মন কেমন করে।
নবীন চিকন অশথ-পাতায়,
আলোর চমক কানন মাতায়,
যে রূপ জাগায় চোখের আগায়
কিসের স্বপন সে।
কী চাই, কী চাই, বচন না পাই
মনের মতন রে।

অচিন বেদন আমার ভাষায়
মিশায় যখন রে
আপন গানের গভীর নেশায়
মন কেমন করে।
তরল চোখের তিমির-তারায়
যখন আমার পরান হারায়
বাজায় সেতার সেই অচেনার
মায়ার স্বপন যে।
কী চাই, কী চাই, সুর যে না পাই
মনের মতন রে।

হেলায় খেলায় কোন্ অবেলায়
হঠাৎ মিলন রে।
সুখের দুখের দুয়ের মেলায়
মন কেমন করে।

পূরবী

বঁধুর বাহুর মধুর পরশ
কায়ায় জাগায় মায়ার হরষ,
তাহার মাঝার সেই অচেনার
চপল স্বপন যে।
কী চাই, কী চাই, বাঁধন না পাই
মনের মতন রে।

প্রিয়ার হিয়ার ছায়ায় মিলায়
অচিন সে জন যে।
ছুঁই কি না ছুঁই বুঝি না কিছুই,
মন কেমন করে।
চরণে তাহার পরান বুলাই,
অরূপ দোলায় রূপেরে দুলাই ;
আঁখির দেখায় আঁচল ঠেকায়
অধরা স্বপন যে।
চেনা অচেনায় মিলন ঘটায়
মনের মতন রে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

বকুলবনের পাখি

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
দেখো তো, আমায় চিনিতে পারিবে না কি।
নই আমি কবি, নই জ্ঞান-অভিমানী,
মান-অপমান কী পেয়েছি নাহি জানি
দেখেছ কি মোর দূরে-যাওয়া মনখানি—
উড়ে-যাওয়া মোর আঁখি ?
আমাতে কি কিছু দেখেছ তোমারি সম,
অসীম-নীলিমা-তিয়াষি বন্ধু মম ?

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
কবে দেখেছিলে মনে পড়ে সে-কথা কি।
বালক ছিলাম কিছু নহে তার বাড়া,
রবির আলোর কোলেতে ছিলেম ছাড়া,
চাঁপার গন্ধ বাতাসের প্রাণকাড়া
যেত মোরে ডাকি ডাকি।
সহজ রসের ঝরনাধারার 'পরে
গান ভাসাতেম সহজ সুখের ভরে।

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
কাছে এসেছিনু ভুলিতে পারিবে তা কি।
নগ্ন পরান লয়ে আমি কোন্ সুখে
সারা আকাশের ছিনু যেন বুকে বুকে,
বেলা চলে যেত অবিরত কৌতুকে
সব কাজে দিয়ে ফাঁকি।
শ্যামলা ধরার নাড়ীতে যে-তাল বাজে
নাচিত আমার অধীর মনের মাঝে।

পূরবী

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
দূরে চলে এনু, বাজে তার বেদনা কি।
আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি।
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি।
কিছু কি থাকে না বাকি।
বালক গিয়েছে হারায়ে, সে-কথা লয়ে
কোনো আঁখিজল যায় নি কোথাও বয়ে ?

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
আর-বার তারে ফিরিয়া ডাকিবে না কি।
যায় নি সেদিন যেদিন আমারে টানে,
ধরার খুশিতে আছে সে সকলখানে।
আজ বেঁধে দাও আমার শেষের গানে
তোমার গানের রাখি।
আবার বারেক ফিরে চিনে লও মোরে,
বিদায়ের আগে লও গো আপন ক'রে।

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
সেদিন চিনেছ, আজিও চিনিবে না কি।
পারঘাটে যদি যেতে হয় এইবার
খেয়ালখেয়ায় পাড়ি দিয়ে হব পার,
শেষের পেয়ালা ভরে দাও, হে আমার
সুরের সুরার সাকী।
আর কিছু নই, তোমারি গানের সাথি,
এই কথা জেনে আসুক ঘুমের রাতি।

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
মুক্তির টিকা ললাটে দাও তো আঁকি।
যাবার বেলায় যাব না ছদ্মবেশে,
খ্যাতির মুকুট খসে যাক নিঃশেষে,
কর্মের এই বর্ম যাক-না ফেঁসে,
কীর্তি যাক-না ঢাকি।
ডেকে লও মোরে নামহারাদের দলে
চিহ্নবিহীন উধাও পথের তলে।

শোনো শোনো, ওগো বকুলবনের পাখি,
যাই যবে যেন কিছুই না যাই রাখি।
ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে,
তারার মতন যাই যেন রাত-ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চলে যাই গান হাঁকি।
বেণুপল্লবমর্মররব-সনে
মিলাই যেন গো সোনার গোধূলিখনে।

ফাল্গুন, ১৩৩০

পথিক

সাবিত্রী

ঘন-অশ্রুবাষ্পে-ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি
ফেলো, ফেলো টুটি।
হে সূর্য, হে মোর বন্ধু, জ্যোতির কনকপদ্মখানি
দেখা দিক ফুটি।
বহ্নিবীণা বক্ষে লয়ে, দীপ্ত কেশে, উদ্‌বোধিনী বাণী
সে-পদ্মের কেন্দ্র-মাঝে নিত্য রাজে, জানি তারে জানি।
মোর জন্মকালে
প্রথম প্রত্যূষে মম তাহারি চুম্বন দিলে আনি
আমার কপালে।

সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে,
অগ্নির প্রবাহ।
উচ্ছ্বসি উঠিল মন্দ্রি বারম্বার মোর গানে গানে
শান্তিহীন দাহ।
ছন্দের বন্যায় মোর রক্ত নাচে সে চুম্বন লেগে,
উন্মাদ সংগীত কোথা ভেসে যায় উদ্দাম আবেগে,
আপনা-বিস্মৃত।
সে চুম্বনমন্ত্রে বক্ষে অজানা ক্রন্দন উঠে জেগে
ব্যথায়-বিস্মিত।

তোমার হোমাগ্নি-মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি,
তারে নমো নম।
তমিস্রসুপ্তির কূলে যে বংশী বাজাও, আদিকবি,
ধ্বংস করি তম
সে-বংশী আমারি চিত্ত, রন্ধ্রে তারি উঠিছে গুঞ্জরি—
মেঘে মেঘে বর্ণচ্ছটা, কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীমঞ্জরী,
নির্ঝরে কল্লোল।

তাহারি ছন্দের ভঙ্গে সর্ব অঙ্গে উঠিছে সঞ্চরি
জীবনহিল্লোল।

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী;
আয়ুস্রোতমুখে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে— কৌতুকে ধরণী
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফুরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালির শিশিরচ্ছুরিত
উৎসুক আলোক।
তরঙ্গহিল্লোলে নাচে রশ্মি তব, বিস্ময়ে পূরিত
করে মুগ্ধ চোখ।

তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে
কেই বা সে জানে।
কী জাল হতেছে বোনা স্বপ্নে স্বপ্নে নানা বর্ণডোরে
মোর গুপ্তপ্রাণে।
তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা;
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হোক হাসিকান্না ভাবনাবেদনা—
না বাঁধুক মোরে।

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণবর্ষণে;
যোগ দিক নির্ঝরের মঞ্জীরগুঞ্জনকলরবে
উপলঘর্ষণে।

ঝঙ্কার-মদিরা-মত্ত বৈশাখের তাণ্ডবলীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।
তার পরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে।

হে রবি, প্রাঙ্গণে তব শরতের সোনার বাঁশিতে
জাগিল মূর্ছনা।
আলোতে শিশিরে বিশ্ব দিকে দিকে অশ্রুতে হাসিতে
চঞ্চল উন্মনা।
জানি না কী মত্ততায়, কী আহ্বানে, আমার রাগিণী
ধেয়ে যায় অন্যমনে শূন্যপথে হয়ে বিবাগিনী
লয়ে তার ডালি।
সে কি তব সভাস্থলে স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী
আলোর কাঙালি?

দাও, খুলে দাও দ্বার, ওই তার বেলা হল শেষ—
বুকে লও তারে।
শান্তি-অভিষেক হোক, ধৌত হোক সকল আবেশ
অগ্নি-উৎসধারে।
সীমন্তে গোধূলিলগ্নে দিয়ো এঁকে সন্ধ্যার সিন্দুর,
প্রদোষের তারা দিয়ে লিখো রেখা আলোকবিন্দুর
তার স্নিগ্ধ ভালে।
দিনান্তসংগীতধ্বনি সুগম্ভীর বাজুক সিন্ধুর
তরঙ্গের তালে।

হারুনা-মারু জাহাজ
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪

পূর্ণতা

স্তব্ধরাতে একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অশ্রুনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি,—
"তুমি দূরে যাও যদি
নিরবধি
শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশবিস্তীর্ণ ক্লান্তি
সব শান্তি
চিত্ত হতে করিবে হরণ—
নিরানন্দ নিরালোক
স্তব্ধ শোক
মরণের অধিক মরণ।"

শুনে, তোর মুখখানি
বক্ষে আনি
বলেছিনু তোরে কানে কানে,-

"তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনাবিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে আলোকে।
বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে, প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্মের নিকটতম দ্বার—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার।"

৩

দুজনের সেই বাণী,
কানাকানি,
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা;
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তার পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।

পূরবী

দেখাশুনা হল সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর।
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন।

হারুনা-মারু জাহাজ
১ অক্টোবর, ১৯২৪

আহ্বান

আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া।
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।
দীপখানি তুলে ধ'রে, মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি
চিনেছে আমারে।
তারি সেই চাওয়া, সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।

সহস্রের বন্যাস্রোতে জন্ম হতে মৃত্যুর আঁধারে
চলে যাই ভেসে।
নিজেরে হারায়ে ফেলি অস্পষ্টের প্রচ্ছন্ন পাথারে
কোন্ নিরুদ্দেশে।
নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতির
তমসার মাঝে
কোথা হতে অকস্মাৎ কর মোরে খুঁজিয়া বাহির
তাহা বুঝি না যে।

তবে কণ্ঠে মোর নাম যেই শুনি গান গেয়ে উঠি,—
"আছি আমি আছি।"
সেই আপনার গানে লুপ্তির কুয়াশা ফেলে টুটি
বাঁচি, আমি বাঁচি।
তুমি মোরে চাও যবে অব্যক্তের অখ্যাত আবাসে
আলো উঠে জ্বলে;
অসাড়ের সাড়া জাগে, নিশ্চল তুষার গলে আসে
নৃত্যকলরোলে।

নিঃশব্দচরণে উষা নিখিলের সুপ্তির দুয়ারে
দাঁড়ায় একাকী,
রক্ত-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নাম ধরি কারে
চলে যায় ডাকি।
অমনি প্রভাত তার বীণা হাতে বাহিরিয়া আসে,
শূন্য ভরে গানে ;
ঐশ্বর্য ছড়ায়ে দেয় মুক্তহস্তে আকাশে আকাশে,
ক্লান্তি নাহি জানে।

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে ; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে ;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।

তাই তো গোপন ধন খুঁজে পায় অকিঞ্চন ধূলি
নিরুদ্ধ ভাণ্ডারে।
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আপনার দৈন্য যায় ভুলি
পত্রপুষ্পভারে।
দেবতার প্রার্থনায় কার্পণ্যের বন্ধ মুষ্টি খুলে,
রিক্ততারে টুটি
রহস্যসমুদ্রতল উন্মথিয়া উঠে উপকূলে
রত্ন মুঠি মুঠি।

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্তের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকুতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু বাহু বাড়ালে।

তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানসতরঙ্গতলে বাণীর সংগীতশতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমিরবক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে;
বীরের দক্ষিণহস্ত মুক্তিমন্ত্রে বজ্র করে বশ,
অসত্যেরে হানে।

হে অভিসারিকা, তব বহুদূর পদধ্বনি লাগি
আপনার মনে
বাণীহীন প্রতীক্ষায় আমি আজ একা বসে জাগি
নির্জন প্রাঙ্গণে।
দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলিপরশ।
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায় আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস।

পূরবী

নিদ্রাহীন বেদনায় ভাবি, কবে আসিবে পরানে
চরম আহ্বান।
মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।
কোথা তুমি শেষবার যে ছোঁয়াবে তব স্পর্শমণি
আমার সংগীতে।
মহানিস্তব্ধের প্রান্তে কোথা বসে রয়েছ, রমণী,
নীরব নিশীথে।

মহেন্দ্রের বজ্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো আনো ডাকি;
বর্ষণকাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কালবৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তার স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হয়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি করো পরিত্রাণ,
সব লও লুটে।

তার পরে যাও যদি যেয়ো চলি; দিগন্ত-অঙ্গন
হয়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।
স্বচ্ছ আনন্দের মাঝে মিলে যাবে সর্বশেষ লাভ,
সর্বশেষ ক্ষতি;
দুঃখে সুখে পূর্ণ হবে অরূপসুন্দর আবির্ভাব,
অশ্রুধৌত জ্যোতি।

পূরবী

ওরে পান্থ, কোথা তোর দিনান্তের যাত্রাসহচরী।
দক্ষিণপবন
বহুক্ষণ চলে গেছে অরণ্যের পল্লব মর্মরি ;
নিকুঞ্জভবন
গন্ধের ইঙ্গিত দিয়ে বসন্তের উৎসবের পথ
করে না প্রচার।
কাহারে ডাকিস তুই, গেছে চলে তার স্বর্ণরথ
কোন্ সিন্ধুপার।

জানি জানি, আপনার অন্তরের গহনবাসীরে
আজিও না চিনি।
সন্ধ্যারতিলগ্নে কেন আসিলে না নিভৃত মন্দিরে
শেষ পূজারিনী।
কেন সাজালে না দীপ, তোমার পূজার মন্ত্রগানে
জাগায়ে দিলে না
তিমিররাত্রির বাণী গোপনে যা লীন আছে প্রাণে
দিনের-অচেনা।

অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।
রচিয়া রাখে নি মোর প্রেয়সী কি বরণের ডালি
মরণের কূলে।
সেথানে কি পুষ্পবনে গীতহীনা রজনীর তারা
নব জন্ম লভি
এই নীরবের বক্ষে নব ছন্দে ছুটাবে ফোয়ারা
প্রভাতী ভৈরবী।

হারুনা-মারু জাহাজ
১ অক্টোবর, ১৯২৪

ছবি

ক্ষুব্ধ চিহ্ন এঁকে দিয়ে শান্ত সিন্ধুবুকে
তরী চলে পশ্চিমের মুখে।
আলোকচুম্বনে নীল জল
করে ঝলমল।
দিগন্তে মেঘের জালে বিজড়িত দিনান্তের মোহ,
সূর্যান্তের শেষ সমারোহ।
ঊর্ধ্বে যায় দেখা
তৃতীয়ার শীর্ণ শশীলেখা।
যেন কে উলঙ্গ শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে,
নিঃসংকোচে হাসে।
বহে মন্দ মন্থর বাতাস
সঙ্গশূন্য সায়াহ্নের বৈরাগ্যনিশ্বাস।
স্বর্গমুখে ক্লান্ত কোন্ দেবতার বাঁশির পূরবী
শূন্যতলে ধরে এই ছবি।
ক্ষণকাল পরে যাবে ঘুচে,
উদাসীন রজনীর কালো কেশে সব দেবে মুছে।

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্তে যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা, কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

হারুনা-মারু জাহাজ
২ অক্টোবর, ১৯২৪

লিপি

হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড় ফিরে ফিরে।
প্রত্যুষে গোপনে ধীরে ধীরে
আঁধারের খুলিয়া পেটিকা
স্বর্ণবর্ণে-লিখা
প্রভাতের মর্মবাণী
বক্ষে টেনে আনি
গুঞ্জরিয়া কত সুরে আবৃত্তি কর যে মুগ্ধমনে।

বহুযুগ হয়ে গেল কোন্ শুভক্ষণে
বাষ্পের গুণ্ঠনখানি প্রথম পড়িল যবে খুলে,
আকাশে চাহিলে মুখ তুলে।
অমর জ্যোতির মূর্তি দেখা দিল আঁখির সম্মুখে।
রোমাঞ্চিত বুকে
পরম বিস্ময় তব জাগিল তখনি।
নিঃশব্দ বরণমন্ত্রধ্বনি
উচ্ছ্বসিল পর্বতের শিখরে শিখরে।
কল্লোল্লাসে উদ্‌ঘোষিল নৃত্যমত্ত সাগরে সাগরে,
"জয়, জয়, জয়।"
ঝঞ্ঝা তার বন্ধ টুটে ছুটে ছুটে কয়,
"জাগো রে, জাগো রে"
বনে বনান্তরে।

প্রথম সে দর্শনের অসীম বিস্ময়
এখনো যে কাঁপে বক্ষোময়।

তলে তলে আন্দোলিয়া উঠে তব ধূলি,
তৃণে তৃণে কণ্ঠ তুলি
ঊর্ধ্বে চেয়ে কয়,
"জয়, জয়, জয়।"
সে বিস্ময় পুষ্পে পর্ণে গন্ধে বর্ণে ফেটে ফেটে পড়ে;
প্রাণের দুরন্ত ঝড়ে,
রূপের উন্মত্ত নৃত্যে, বিশ্বময়
ছড়ায় দক্ষিণে বামে সৃজন প্রলয়;
সে বিস্ময় সুখে দুঃখে গর্জি উঠি কয়,
"জয়, জয়, জয়।"

তোমাদের মাঝখানে আকাশ অনন্ত ব্যবধান;
ঊর্ধ্ব হতে তাই নামে গান।
চিরবিরহের নীল পত্রখানি-'পরে
তাই লিপি লেখা হয় অগ্নির অক্ষরে।
বক্ষে তারে রাখ,
শ্যাম আচ্ছাদনে ঢাক;
বাক্যগুলি
পুষ্পদলে রেখে দাও তুলি,—
মধুবিন্দু হয়ে থাকে নিভৃত গোপনে;
পদ্মের রেণুর মাঝে গন্ধের স্বপনে
বন্দী কর তারে;
তরুণীর প্রেমাবিষ্ট আঁখির ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে
রাখ তারে ভরি;
সিন্ধুর কল্লোলে মিলি — নারিকেল-পল্লবে মর্মরি
সে বাণী ধ্বনিতে থাকে তোমার অন্তরে;
মধ্যাহ্নে শোন সে বাণী অরণ্যের নির্জন নির্ঝরে।

বিরহিণী, সে-লিপির যে-উত্তর লিখিতে উন্মনা
আজো তাহা সাঙ্গ হইল না।
যুগে যুগে বারম্বার লিখে লিখে
বারম্বার মুছে ফেল ; তাই দিকে দিকে
সে ছিন্ন কথার চিহ্ন পুঞ্জ হয়ে থাকে ;
অবশেষে একদিন জ্বলজ্জটা ভীষণ বৈশাখে
উন্মত্ত ধূলির ঘূর্ণিপাকে
সব দাও ফেলে
অবহেলে
আত্মবিদ্রোহের অসন্তোষে।
তার পরে আরবার বসে বসে
নূতন আগ্রহে লেখ নূতন ভাষায়।
যুগযুগান্তর চলে যায়।

কত শিল্পী, কত কবি তোমার সে লিপির লিখনে
বসে গেছে একমনে।
শিখিতে চাহিছে তব ভাষা,
বুঝিতে চাহিছে তব অন্তরের আশা।
তোমার মনের কথা আমারি মনের কথা টানে,
চাও মোর পানে।
চকিত ইঙ্গিত তব, বসনপ্রান্তের ভঙ্গীখানি
অঙ্কিত করুক মোর বাণী।
শরতে দিগন্ততলে
ছলছলে
তোমার যে অশ্রুর আভাস,
আমার সংগীতে তারি পড়ুক নিশ্বাস।

পূরবী

অকারণ চাঞ্চল্যের দোলা লেগে
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে জেগে
কটিতটে যে কলকিঙ্কিণী,
মোর ছন্দে দাও ঢেলে তারি রিনিরিনি,
ওগো বিরহিণী।

দূর হতে আলোকের বরমাল্য এসে
খসিয়া পড়িল তব কেশে,
স্পর্শে তারি কভু হাসি কভু অশ্রুজলে
উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় বক্ষতলে
ওঠে যে ক্রন্দন,
মোর ছন্দে চিরদিন দোলে যেন তাহারি স্পন্দন।

স্বর্গ হতে মিলনের সুধা
মর্তের বিচ্ছেদপাত্রে সংগোপনে রেখেছ, বসুধা;
তারি লাগি নিত্যক্ষুধা,
বিরহিণী অয়ি,
মোর সুরে হোক জ্বালাময়ী।

হারুনা-মারু জাহাজ
৪ অক্টোবর, ১৯২৪

ক্ষণিকা

খোলো খোলো হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা,-
খুঁজে নিতে দাও সেই আনন্দের হারানো কণিকা।
কবে সে যে এসেছিল আমার হৃদয়ে যুগান্তরে
গোধূলিবেলার পান্থ জনশূন্য এ মোর প্রান্তরে
লয়ে তার ভীরু দীপশিখা।
দিগন্তের কোন্ পারে চলে গেল আমার ক্ষণিকা।

ভেবেছিনু গেছি ভুলে ; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার ;
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।

বিরহের দূতী এসে তার সে স্তিমিত দীপখানি
চিত্তের অজানা কক্ষে কখন রাখিয়া দিল আনি।
সেখানে যে বীণা আছে অকস্মাৎ একটি আঘাতে
মুহূর্ত বাজিয়াছিল ; তার পরে শব্দহীন রাতে
বেদনাপদ্মের বীণাপাণি
সন্ধান করিছে সেই অন্ধকারে থেমে-যাওয়া বাণী।

সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন।

পূরবী

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি,
বারেক ফিরায়ে মুখ পথ-মাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হলে পরমলগ্নে, সখী,
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি।

হে পান্থ, সে পথে তব ধূলি আজ করি যে সন্ধান ;—
বঞ্চিত মুহূর্তখানি পড়ে আছে সেই তব দান।
অপূর্ণের রেখাগুলি তুলে দেখি, বুঝিতে না পারি —
চিহ্ন কোনো রেখে যাবে, মনে তাই ছিল কি তোমারি।
ছিন্ন ফুল, এ কি মিছে ভান।
কথা ছিল শুধাবার, সময় হল যে অবসান।

গেল না ছায়ার বাধা ; না-বোঝার প্রদোষ-আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয়মোহের নেশা ; সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা, তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।

খোলো খোলো, হে আকাশ, স্তব্ধ তব নীল যবনিকা।
খুঁজিব তারার মাঝে চঞ্চলের মালার মণিকা।
খুঁজিব সেথায় আমি যেথা হতে আসে ক্ষণতরে
আশ্বিনে গোধূলি-আলো, যেথা হতে নামে পৃথ্বী-'পরে
শ্রাবণের সায়াহ্নযূথিকা ;
যেথা হতে পরে ঝড় বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত টিকা।

হারুনা-মারু জাহাজ
৬ অক্টোবর, ১৯২৪

খেলা

সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ,
ওগো খেলার সাথি।
হঠাৎ কেন চমকে তোলে শূন্য এ প্রাঙ্গণ
রঙিন শিখার বাতি।
কোন্ সে ভোরের রঙের খেয়াল কোন্ আলোতে ঢেকে
সমস্ত দিন বুকের তলায় লুকিয়ে দিলে রেখে,
অরুণ-আভাস ছানিয়ে নিয়ে পল্লবনের থেকে
রাঙিয়ে দিলে রাতি?
উদয়ছবি শেষ হবে কি অস্ত-সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি।

হারিয়ে-ফেলা বাঁশি আমার পালিয়েছিল বুঝি
লুকোচুরির ছলে?
বনের পারে আবার তারে কোথায় পেলে খুঁজি
শুকনো পাতার তলে?
যে-সুর তুমি শিখিয়েছিলে বসে আমার পাশে
সকালবেলায় বটের তলায় শিশিরভেজা ঘাসে
সে আজ ওঠে হঠাৎ বেজে বুকের দীর্ঘশ্বাসে—
উছল চোখের জলে—
কাঁপত যে-সুর ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত বাতাসে
শুকনো পাতার তলে।

মোর প্রভাতের খেলার সাথি আনত ভরে সাজি
সোনার চাঁপাফুলে।
অন্ধকারে গন্ধ তারি ঐ যে আসে আজি,
এ কি পথের ভুলে।

পূরবী

বকুলবীথির তলে তলে আজ কি নতুন বেশে
সেই খেলাতেই ডাকতে এল আবার ফিরে এসে।
সেই সাজি তার দখিন হাতে, তেমনি আকুল কেশে
চাঁপার গুচ্ছ তুলে।
সেই অজানা হতে আসে এই অজানার দেশে,
এ কি পথের ভুলে।

আমার কাছে কী চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু
তেমনি হবে সারা।
সেদিন ভোরে দেখেছিলাম প্রথম জেগে উঠে,
নিরুদ্দেশের পাগল হাওয়ায় আগল গেছে টুটে—
কাজভোলা সব খেপার দলে তেমনি আবার জুটে
করবে দিশেহারা।
স্বপনমৃগ ছুটিয়ে দিয়ে পিছনে তার ছুটে
তেমনি হব সারা।

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
চলতে দেবে নাকো?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাকজ্বালা বনের আঁধার হতে
তাই কি আমায় ডাক'।
সকল চিন্তা উধাও ক'রে অকারণের টানে
অবুঝ ব্যথার চঞ্চলতা জাগিয়ে দিয়ে প্রাণে
থর্‌থরিয়ে কাঁপিয়ে বাতাস ছুটির গানে গানে
দাঁড়িয়ে কোথায় থাক।
না জেনে পথ পড়ব তোমার বুকেরই মাঝখানে
তাই আমারে ডাক'।

পূরবী

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথি।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি।

হারুনা-মারু জাহাজ
৭ অক্টোবর, ১৯২৪

অপরিচিতা

পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম এক
তোমার সাথে কই হল গো দেখা।
কুয়াশাতে ঘন আকাশ, ম্লান শীতের ক্ষণে
ফুল-ঝরাবার বাতাস বেড়ায় কাঁপনলাগা বনে।
সকলশেষের শিউলিটি যেই ধুলায় হবে ধূলি,
সঙ্গিনীহীন পাখি যখন গান যাবে তার ভুলি,
হয়তো তুমি আপন-মনে আসবে সোনার রথে
শুকনো-পাতা ঝরা-ফুলের পথে।

পুলক লেগেছিল মনে পথের নূতন বাঁকে
হঠাৎ সেদিন কোন্‌ মধুরের ডাকে।
দূরের থেকে ক্ষণে-ক্ষণে রঙের আভাস এসে
গগনকোণে চমক হেনে গেছে কোথায় ভেসে ;
মনের ভুলে ভেবেছিলাম, তুমিই বুঝি এলে
গন্ধরাজের গন্ধে তোমার গোপন মায়া মেলে।
হয়তো তুমি এসেছিলে, যায় নি আড়ালখানা,
চোখের দেখায় হয় নি প্রাণের জানা।

হয়তো সেদিন তোমার আঁখির ঘন তিমির ব্যেপে
অশ্রুজলের আবেশ গেছে কেঁপে।
হয়তো আমায় দেখেছিলে বাঁকিয়ে বাঁকা ভুরু,
বক্ষ তোমার করেছিল ক্ষণেক দুরুদুরু ;
সেদিন হতে স্বপ্ন তোমার ভোরের আধো-ঘুমে
রঙিয়েছিল হয়তো ব্যথার রক্তিম কুঙ্কুমে ;
আধেক-চাওয়ায় ভুলে-যাওয়ায় হয়েছে জাল বোনা,
তোমায় আমায় হয় নি জানাশোনা।

পূরবী

তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো
রেখে গেলাম গান গাঁথিলাম যত।
মনের মাঝে বাজল যেদিন দূর চরণের ধ্বনি
সেদিন আমি গেয়েছিলাম তোমার আগমনী ;
দখিনবাতাস ফেলেছে শ্বাস রাতের আকাশ ঘেরি,
সেদিন আমি গেয়েছি গান তোমার বিরহেরি ;
ভোরের বেলায় অশ্রুভরা অধীর অভিমান
ভৈরবীতে জাগিয়েছিল গান।

এ গানগুলি তোমার বলে চিনবে কখনো কি।
ক্ষতি কি তায়, নাই চিনিলে, সখী।
তবু তোমায় গাইতে হবে, নাই তাহে সংশয়—
তোমার কণ্ঠে বাজবে তখন আমার পরিচয় ;
যারে তুমি বাসবে ভালো, আমার গানের সুরে
বরণ ক'রে নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে।
রোদন খুঁজে ফিরবে তোমার প্রাণের বেদনখানি,
আমার গানে মিলবে তাহার বাণী।

তোমার ফাগুন উঠবে জেগে ভরবে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে।
পূর্ণচাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুলবীথির ছায়াখানি মধুর মূর্ছা-ভরা ;
হয়তো সেদিন বক্ষে তোমার মিলনমালা গাঁথা,
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা—
সেদিন আমি আসব না তো নিয়ে আমার দান,
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান।

আণ্ডেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

আন্‌মনা

আন্‌মনা গো, আন্‌মনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে,— সত্য আমার বুঝবে কবে।
তোমারো মন জানব না,
আন্‌মনা গো, আন্‌মনা।
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা,
আন্‌মনা গো আন্‌মনা।

জনশূন্য তটের পানে ফিরবে হাঁসের দল ;
স্বচ্ছ নদীর জল
আকাশ-পানে রইবে পেতে কান
বুকের তলে শুনবে ব'লে গ্রহতারার গান ;
কুলায়-ফেরা পাখি
নীল আকাশের বিরামখানি রাখবে ডানায় ঢাকি ;
বেণুশাখার অন্তরালে অস্তপারের রবি
আঁকবে মেঘে, মুছবে আবার শেষবিদায়ের ছবি ;
স্তব্ধ হবে দিনের বেলার ক্ষুব্ধ হাওয়ার দোলা ;
তখন তোমার মন যদি রয় খোলা —
তখন সন্ধ্যাতারা
পায় যদি তার সাড়া
তোমার উদার আঁখিতারার পারে ;
কনকচাঁপার-গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে
ক্লান্তি-অলস ভাবনা যদি ফুলবিছানো ভুঁয়ে
মেলিয়ে ছায়া এলিয়ে থাকে শুয়ে ;

ছন্দে-গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে,
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রানীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে একমনে
এঁকে যাব আমার গানের আলপনা,
আন্‌মনা গো, আন্‌মনা।

আণ্ডেস জাহাজ
১৮ অক্টোবর, ১৯২৪

বিস্মরণ

মনে আছে কার দেওয়া সেই ফুল ?
সে-ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তারে সাজিয়ে রাখাই ভুল—
মিথ্যে কেন কাঁদিয়ে রাখ তাকে।
ধুলায় তারি শান্তি, তারি গতি,
এই সমাদর কোরো তাহার প্রতি —
সময় যখন গেছে তখন তারে
ভুলো একেবারে।

মাঘের শেষে নাগকেশরের ফুলে
আকাশে বয় মনহারানো হাওয়া ;
বনের বক্ষ উঠেছে আজ দুলে,
চামেলি ওই কার যেন পথচাওয়া।
ছায়ায় ছায়ায় কাদের কানাকানি,
চোখে চোখে নীরব জানাজানি—
এ উৎসবে শুকনো ফুলের লাজ
ঘুচিয়ে দিয়ো আজ।

যদি বা তার ফুরিয়ে থাকে বেলা,
মনে জেনো দুঃখ তাহে নাই।
করেছিল ক্ষণকালের খেলা,
পেয়েছিল ক্ষণকালের ঠাঁই।
অলকে সে কানের কাছে দুলি
বলেছিল নীরব কথাগুলি—
গন্ধ তাহার ফিরেছে পথ ভুলে
তোমার এলোচুলে।

সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি।
লুকিয়ে সে কি রয় নি কোনোখানে।
কাহিনী তার থাকবে না আর বাকি
কোনো স্বপ্নে, কোনো গন্ধে গানে?
আরেক দিনের বনচ্ছায়ায় লিখা
ফিরবে না কি তাহার মরীচিকা।
অশ্রুতে তার আভাস দিবে নাকি
আরেক দিনের আঁখি।

নাহয় তাও লুপ্ত যদিই হয়,
তার লাগি শোক সেও তো সেই পথে।
এ জগতে সদাই ঘটে ক্ষয়,
ক্ষতি তবু হয় না কোনোমতে।
শুকিয়ে-পড়া পুষ্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি —
সেই ধুলারই বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে।

আণ্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

আশা

মস্ত যে-সব কাণ্ড করি শক্ত তেমন নয় ;
জগৎ-হিতের তরে ফিরি বিশ্বজগৎময় ।
সঙ্গীর ভিড় বেড়ে চলে ; অনেক লেখাপড়া,
অনেক ভাষায় বকাবকি, অনেক ভাঙাগড়া ।
ক্রমে ক্রমে জাল গেঁথে যায়, গিঁঠের 'পরে গিঁঠ ;
মহল 'পরে মহল ওঠে, ইঁটের 'পরে ইঁট ।
কীর্তিরে কেউ ভালো বলে, মন্দ বলে কেহ ;
বিশ্বাসে কেউ কাছে আসে, কেউ করে সন্দেহ ।
কিছু খাঁটি, কিছু ভেজাল, মসলা যেমন জোটে
মোটের 'পরে একটা কিছু হয়ে ওঠেই ওঠে ।

কিন্তু যে-সব ছোটো আশা করুণ অতিশয়
সহজ বটে শুনতে লাগে, মোটেই সহজ নয় ।
একটুকু সুখ গানের সুরে ফুলের গন্ধে মেশা,
গাছের-ছায়ায় স্বপ্ন-দেখা অবকাশের নেশা,
মনে ভাবি, চাইলে পাব ; যখন তারে চাহি
তখন দেখি চঞ্চলা সে কোনোখানেই নাহি ।

অরূপ অকূল বাষ্প-মাঝে বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে,
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ,
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ ।

পূরবী

বহুদিন মনে ছিল আশা—
ধরণীর এককোণে
রহিব আপন মনে ;
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।
গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া, নদীটির ধারা,
ঘরে-আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, এইটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা—
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী ;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।
মেঘে মেঘে এঁকে যায় অস্তগামী রবি
কল্পনার শেষ রঙে সমাপ্তির ছবি,
আপন স্বপনলোক আলোকে ছায়ায়
রঙে রসে রচি দিব তেমনি মায়ায়।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, ধেয়ানের ভাষা
করেছিনু আশা।

বহুদিন মনে ছিল আশা—
প্রাণের গভীর ক্ষুধা
পাবে তার শেষ সুধা ;
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।
হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,
দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথাভরা আভা।
তাহারে জড়ায়ে ঘিরে
ভরিয়া তুলিব ধীরে
জীবনের কদিনের কাঁদা আর হাসা।
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালোবাসা
করেছিনু আশা।

আণ্ডেস জাহাজ
১৯ অক্টোবর, ১৯২৪

বাতাস

গোলাপ বলে, ওগো বাতাস, প্রলাপ তোমার বুঝতে কে বা পারে,
কেন এসে ঘা দিলে মোর দ্বারে।
বাতাস বলে, ওগো গোলাপ, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার পরশ খোঁজ ;
সেই প্রভাতের আলো এল, আমি কেবল ভাঙিয়ে দিলাম ঘুম
হে মোর কুসুম।

পাখি বলে, ওগো বাতাস, কী তুমি চাও বুঝিয়ে বলো মোরে,
কুলায় আমার দুলাও কেন ভোরে।
বাতাস বলে, ওগো পাখি, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি তুমি কারে খোঁজ ;
সেই আকাশে জাগল আলো, আমি কেবল দিনু তোমায় আনি
সীমাহীনের বাণী।

নদী বলে, ওগো বাতাস, বুঝতে নারি কী যে তোমার কথা,
কিসের লাগি এতই চঞ্চলতা।
বাতাস বলে, ওগো নদী, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
জানি তোমার বিলয় যেথা খোঁজ ;
সেই সাগরের ছন্দ আমি এনে দিলাম তোমার বুকের কাছে,
তোমার ঢেউয়ের নাচে।

অরণ্য কয়, ওগো বাতাস, নাহি জানি বুঝি কি নাই বুঝি,
তোমার ভাষায় কাহার চরণ পূজি।
বাতাস বলে, হে অরণ্য আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার মিলন খোঁজ ;
সেই বসন্ত এল পথে, আমি কেবল সুর জাগাতে পারি
তাহার পূর্ণতারি।

শুধায় সবে, ওগো বাতাস, তবে তোমার আপন কথা কী যে
বলো মোদের, কী চাও তুমি নিজে।
বাতাস বলে, আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি বুঝি তোমরা কারে খোঁজ—
আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান।

লিস্‌বন বন্দর, আণ্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর, ১৯২৪

স্বপ্ন

তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি,
তুমি আমায় বারে বারে শুধাও, "ওগো, সত্য সে কি।"
কী জানি গো, হয়তো বুঝি
তোমার মাঝে কেবল খুঁজি
এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি।
হয়তো হেরি তোমার চোখে
আদিযুগের ইন্দ্রলোকে
শিশু-চাঁদের পথভোলানো পারিজাতের ছায়াবীথি।
এই কূলেতে ডাকি যখন সাড়া যে দাও সেই ওপারে,
পরশ তোমার ছাড়িয়ে কায়া বাজে মায়ার বীণার তারে।
হয়তো হবে সত্য তাই,
হয়তো তোমার স্বপন আমার আপন মনের মত্ততাই।

আমি বলি, স্বপ্ন যাহা তার চেয়ে কি সত্য আছে।
যে-তুমি মোর দূরের মানুষ সেই-তুমি মোর কাছের কাছে।
সেই-তুমি আর নও তো বাঁধন,
স্বপ্নরূপে মুক্তিসাধন—
ফুলের সাথে তারার সাথে তোমার সাথে সেথায় মেলা।
নিত্যকালের বিদেশিনী,
তোমায় চিনি, নাই বা চিনি,
তোমার লীলায় ঢেউ তুলে যায় কভু সোহাগ কভু হেলা।
চিত্তে তোমার মূর্তি নিয়ে ভাবসাগরের খেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।
আমার কাছে সত্য তাই,
মনভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

আপনি তুমি দেখেছ কি আপন-মাঝে সত্য কী যে।
দিতে যদি চাও তা কারে দিতে কি তাই পার নিজে।
হয়তো তারে দুঃখদিনে
অগ্নি-আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বালবে শিখা।
অমৃত যে হয় নি মথন,
তাই তোমাতে এই অযতন,
তাই তোমারে ঘিরে আছে ছলনছায়ার কুহেলিকা।
নিত্যকালের আপন তোমায় লুকিয়ে বেড়ায় মিথ্যা সাজে-
ক্ষণে ক্ষণে ধরা পড়ে শুধু আমার স্বপন-মাঝে।
আমি জানি, সত্য তাই—
মরণদুঃখে অমর জাগে অমৃতেরই তত্ত্ব তাই।

পুষ্পমালার গ্রন্থিখানা অনাদরে পড়ুক ছিঁড়ে,
ফুরাক বেলা, জীর্ণ খেলা হারাক হেলাফেলার ভিড়ে।
ছল করে যা পিছু ডাকে
পিছন ফিরে চাস নে তাকে,
ডাকে না যে যাবার বেলায় যাস নে তাহার পিছে পিছে।
যাওয়া-আসা-পথের ধুলায়
চপল পায়ের চিহ্নগুলায়
গ'নে গ'নে আপন মনে কাটাস নে দিন মিছে মিছে।
কী হবে তোর বোঝাই করে ব্যর্থ দিনের আবর্জনা ;
স্বপ্ন শুধুই মর্তে অমর, আর সকলই বিড়ম্বনা।
নিত্য প্রাণের সত্য তাই,
প্রাণ দিয়ে তুই রচিস যারে— অসীম পথের পথ্য তাই॥

লিস্‌বন বন্দর, আণ্ডেস জাহাজ
২০ অক্টোবর, ১৯২৪

সমুদ্র

১

হে সমুদ্র, স্তব্ধচিত্তে শুনেছিনু গর্জন তোমার
রাত্রিবেলা ; মনে হল, গাঢ় নীল নিঃসীম নিদ্রার
স্বপ্ন ওঠে কেঁদে কেঁদে। নাই, নাই তোমার সান্ত্বনা ;
যুগযুগান্তর ধরি নিরন্তর সৃষ্টির যন্ত্রণা
তোমার রহস্যগর্ভে ছিন্ন করি কৃষ্ণ আবরণ
প্রকাশ সন্ধান করে। কত মহাদ্বীপ মহাবন
এ তরল রঙ্গশালে রূপে প্রাণে কত নৃত্যে গানে
দেখা দিয়ে কিছুকাল, ডুবে গেছে নেপথ্যের পানে
নিঃশব্দ গভীরে। হারানো সে চিহ্নহারা যুগগুলি
মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য অন্ধ আন্দোলন তুলি
হানিছে তরঙ্গ তব। সব রূপ সব নৃত্য তার
ফেনিল তোমার নীলে বিলীন দুলিছে একাকার।
স্থলে তুমি নানা গান উৎক্ষেপে করেছ আবর্জন,
জলে তব এক গান— অব্যক্তের অস্থির গর্জন।

২

হে সমুদ্র, একা আমি মধ্যরাতে নিদ্রাহীন চোখে
কল্লোলমন্দ্রর মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্তব্ধ ঊর্ধ্বলোকে
চাহিলাম ; শুনিলাম, নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে
আকাশের বিপুল ক্রন্দন ; দেখিলাম শূন্য-মাঝে
আঁধারের আলোকব্যগ্রতা। কত শত মন্বন্তরে
কত জ্যোতির্লোক গূঢ় বহ্নিময় বেদনার ভরে
অস্ফুটের আচ্ছাদন দীর্ণ করি তীক্ষ্ণ রশ্মিঘাতে
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোজ্জ্বল প্রভাতে
প্রকাশ-উৎসবদিনে। যুগসন্ধ্যা কবে এল তার,
ডুবে গেল অলক্ষ্যে অতলে। রূপনিঃস্ব হাহাকার

অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে—
ধুলায় ধুলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্তরূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল।

৩

হে সমুদ্র, চাহিলাম আপন গহন চিত্ত-পানে ;
কোথায় সঞ্চয় তার, অন্ত তার কোথায় কে জানে।
ওই শোনো, সংখ্যাহীন অজানা ক্রন্দন
অমূর্ত আঁধারে ফিরে, অকারণে জাগায় স্পন্দন
বক্ষতলে। এক কালে ছিল রূপ, ছিল বুঝি ভাষা ;
বিশ্বগীতিনির্ঝরের তীরে তীরে বুঝি কত বাসা
বেঁধেছিল কোন জন্মে ; দুঃখে সুখে নানা বর্ণে রাঙি
তাহাদের রঙ্গমঞ্চ হঠাৎ পড়িল কবে ভাঙি
অতৃপ্ত আশার ধূলিস্তূপে। আকার হারালো তারা,
আবাস তাদের নাহি। খ্যাতিহারা সেই স্মৃতিহারা
সৃষ্টিছাড়া ব্যর্থ ব্যথা প্রাণের নিভৃত লীলাঘরে
কোণে কোণে ঘোরে শুধু মূর্তি-তরে, আশ্রয়ের তরে।
রাগে অনুরাগে যারা বিচিত্র আছিল কত রূপে,
আজ শূন্য দীর্ঘশ্বাস আঁধারে ফিরিছে চুপে চুপে।

আণ্ডেস্ জাহাজ
২১ অক্টোবর, ১৯২৪

মুক্তি

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।
সৃষ্টি মোর সৃষ্টি-সাথে মেলে যেথা সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,
সেথা আমি খেলাখেপা বালকের মতো লক্ষ্মীছাড়া,
লক্ষ্যহীন নগ্ন নিরুদ্দেশ।
সেথা মোর চির নব, সেথা মোর চিরন্তন শেষ।

মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে যে সুরে, হে গুণী,
তোমারে চিনায়।
বেঁধে দিয়ো নিজ হাতে সেই নিত্য সুরের ফাল্গুনী
আমার বীণায়।
তা হলে বুঝিব আমি, ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল,
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়;
তোমারি আপন সুর কোন্ তালে তোমারে ভোলায়।

যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে,
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সংগীতে।
সেদিন বুঝিব মনে, নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন;

নেমে যাবে সব বোঝা, থেমে যাবে সকল ক্রন্দন,
ছন্দে তালে ভুলিব আপনা—
বিশ্বগীতপদ্মদলে স্তব্ধ হবে অশান্ত ভাবনা।

সঁপি দিব সুখ দুঃখ আশা ও নৈরাশ্য যতকিছু
তব বীণাতারে—
ধরিবে গানের মূর্তি, একান্তে করিয়া মাথা নিচু
শুনিব তাহারে।
দেখিব— তাদের যেথা ইন্দ্রধনু অকস্মাৎ ফুটে;
দিগন্তে বনের প্রান্তে উষার উত্তরী যেথা লুটে;
বিবাগি ফুলের গন্ধ মধ্যাহ্নে যেথায় যায় ছুটে;
নীড়ে-ধাওয়া পাখির ডানায়
সায়াহ্নগগন যেথা দিবসেরে বিদায় জানায়।

সেদিন আমার রক্তে শুনা যাবে দিবসরাত্রির
নৃত্যের নূপুর;
নক্ষত্র বাজাবে বক্ষে বংশীধ্বনি আকাশযাত্রীর
আলোকবেণুর।
সেদিন বিশ্বের তৃণ মোর অঙ্গে হবে রোমাঞ্চিত,
আমার হৃদয় হবে কিংশুকের রক্তিমালাঞ্ছিত;
সেদিন আমার মুক্তি, যবে হবে, হে চিরবাঞ্ছিত,
তোমার লীলায় মোর লীলা—
যেদিন তোমার সঙ্গে গীতরঙ্গে তালে তালে মিলা।

আণ্ডেস জাহাজ
২২ অক্টোবর, ১৯২৪

ঝড়

অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা,
বন্ধ বাতাস কিসের গন্ধে ঘোলা।
মুখধোবার ঐ ব্যাপারখানা দাঁড়িয়ে আছে সোজা,
ক্লান্ত চোখের বোঝা।
দুলছে কাপড় পেগ্‌এ
বিজ্‌লিপাখার হাওয়ার ঝাপট লেগে।
গায়ে গায়ে ঘেঁষে
জিনিসপত্র আছে কায়ক্লেশে।
বিছানাটা কৃপণগতিকের,
অনিচ্ছাতে ক্ষণকালের সহায় পথিকের।
ঘরে আছে যে-কটা আসবাব,
নিত্য যতই দেখি ভাবি, ওদের মুখের ভাব
নারাজ ভৃত্যসম—
পাশেই থাকে মম,
কোনোমতে করে কেবল কাজচলাগোছ সেবা।
এমন ঘরে আঠারো দিন থাকতে পারে কে বা।

কষ্ট ব'লে একটা দানব ছোট্টো খাঁচায় পুরে
নিয়ে চলে আমায় কত দূরে।
নীল আকাশে, নীল সাগরে অসীম আছে বসে ;
কী জানি কোন্‌ দোষে
ঠেলেঠুলে চেপেচুপে মোরে
সেথান হতে করেছে একঘরে।

হেনকালে ক্ষুদ্র দুখের ক্ষুদ্র ফাটল বেয়ে
কেমন করে এল হঠাৎ ধেয়ে

বিশ্বধরার বক্ষ হতে বিপুল দুখের প্রবল বন্যাধারা ;
এক নিমেষে আমারে সে করলে আত্মহারা।
আনলে আপন বৃহৎ সান্ত্বনারে,
আনলে আপন গর্জনেতে ইন্দ্রলোকের অভয়ঘোষণারে
মহাদেবের তপের জটা হতে
মুক্তিমন্দাকিনী এল কূলডোবানো স্রোতে ;
বললে আমার চিত্ত ঘিরে ঘিরে,
ভস্ম আবার ফিরে পাবে জীবন-অগ্নিরে।
বললে, আমি সুরলোকের অশ্রুজলের দান
মরুর পাথর গলিয়ে ফেলে ফলাই অমর প্রাণ,
মৃত্যুজয়ের ডমরুরব শোনাই কলস্বরে,
মহাকালের তাণ্ডবতাল সদাই বাজাই উদ্দাম নির্ঝরে।

স্বপ্নসম টুটে
এই কেবিনের দেওয়াল গেল ছুটে।
রোগশয্যা মম
হল উদার কৈলাসেরই শৈলশিখর সম।
আমার মনপ্রাণ
উঠল গেয়ে রুদ্রেরই জয়গান।—

সুপ্তির জড়িমাঘোরে
তীরে থেকে তোরা ওরে
করেছিস ভয়
যে-ঝড় সহসা কানে
বজ্রের গর্জন আনে—
"নয়, নয়, নয়।"

তোরা বলেছিলি তাকে,
"বাঁধিয়াছি ঘর।
মিলেছে পাখির ডাকে
তরুর মর্মর।
পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
ফলেছে ক্ষুধার ফল,
ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।"
ঝড় বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে—
"নয়, নয়, নয়।"

সমুদ্রে আমার তরী;
আসিয়াছি ছিন্ন করি
তীরের আশ্রয়।
ঝড়বন্ধু তাই কানে
মাঙ্গল্যের মন্ত্র আনে—
"জয়, জয়, জয়।"
আমি যে সে-প্রচণ্ডেরে
করেছি বিশ্বাস—
তরীর পালে সে যে রে
রুদ্রেরি নিশ্বাস।
বলে সে বক্ষের কাছে,
"আছে আছে, পার আছে,
সন্দেহবন্ধন ছিঁড়ি লহো পরিচয়।"
বলে ঝড় অবিশ্রান্ত,
"তুমি পান্থ, আমি পান্থ,
জয়, জয়, জয়।"

যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে—
বলেছিলি মাথা খুঁড়ে,
"এ দেখি প্রলয়।"
ঝড় বলে, "ভয় নাই,
যাহা দিতে পার' তাই
রয়, রয়, রয়।"
চলেছি সম্মুখ-পানে
চাহিব না পিছু।
ভাসিল বন্যার টানে
ছিল যত কিছু।
রাখি যাহা তাই বোঝা—
তারে খোওয়া, তারে খোঁজা,
নিত্যই গণনা তারে, তারি নিত্য ক্ষয়।
ঝড় বলে, "এ তরঙ্গে
যাহা ফেলে দাও রঙ্গে
রয়, রয়, রয়।"

এ মোর যাত্রীর বাঁশি
ঝঞ্ঝার উদ্দাম হাসি
নিয়ে গাঁথে সুর—
বলে সে, "বাসনা অন্ধ,
নিশ্চল শৃঙ্খলবন্ধ
দূর, দূর, দূর।"
গাহে "পশ্চাতের কীর্তি,
সম্মুখের আশা,
তার মধ্যে ফেঁদে ভিত্তি
বাঁধিস নে বাসা।

নে তোর মৃদঙ্গে শিখে
তরঙ্গের ছন্দটিকে,
বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর।
যত লোভ, যত শঙ্কা,
দাসত্বের জয়ডঙ্কা,
দূর, দূর, দূর।"

এসো গো ধ্বংসের নাড়া,
পথভোলা, ঘরছাড়া,
এসো গো দুর্জয়।
ঝাপটি মৃত্যুর ডানা
শূন্যে দিয়ে যাও হানা—
"নয়, নয়, নয়।"
আবেশের রসে মত্ত
আরামশয্যায়
বিজড়িত যে-জড়ত্ব
মজ্জায় মজ্জায়—
কার্পণ্যের বদ্ধ দ্বারে
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে-আত্মসংকোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়,
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক,
ঘোষুক তোমার শঙ্খ—
"নয়, নয়, নয়।"

আণ্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

পদধ্বনি

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেইমতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
শুনিনু তখনি।
মোর জন্মনক্ষত্রের অদৃশ্য জগতে
মোর ভাগ্য মোর তরে বার্তা লয়ে ফিরিছে কি পথে

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি।
অজানার যাত্রী কে গো। ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।
এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে।
এ কি সেই নিত্যশিশু, কিছু নাহি চাহে—
নিজের খেলেনাচূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে।
ভাঙিয়া স্বপ্নের ঘোর,
ছিঁড়ি মোর
শয্যার বন্ধনমোহ, এ রাত্রিবেলার
মোরে কি করিবে সঙ্গী প্রলয়ের ভাসানখেলায়।

হোক তাই,
ভয় নাই, ভয় নাই,
এ খেলা খেলেছি বারম্বার
জীবনে আমার।
জানি জানি, ভাঙিয়া নূতন করে তোলা ;
ভুলায়ে পূর্বের পথ অপূর্বের পথে দ্বার খোলা ;
বাঁধন গিয়েছে যবে চুকে
তারি ছিন্ন রশিগুলি কুড়ায়ে কৌতুকে
বার বার গাঁথা হল দোলা।
নিয়ে যত মুহূর্তের ভোলা
চিরস্মরণের ধন
গোপনে হয়েছে আয়োজন।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
চিরদিন শুনেছি এমনি
বারে বারে।
এ কি বাজে মৃত্যুসিন্ধুপারে।
এ কি মোর আপন বক্ষেতে।
ডাকে মোরে ক্ষণে ক্ষণে কিসের সংকেতে।
তবে কি হবেই যেতে।
সব বন্ধ করিব ছেদন ?
ওগো কোন্ বন্ধু তুমি, কোন্ সঙ্গী দিতেছ বেদন
বিচ্ছেদের তীর হতে।
তরী কি ভাসাব স্রোতে।
হে বিরহী,
আমার অন্তরে দাও কহি,—

ডাক' মোরে কী খেলা খেলাতে
আতঙ্কিত নিশীথবেলাতে।

বারে বারে দিয়েছ নিঃসঙ্গ করি ;
এ শূন্য প্রাণের পাত্র কোন্ সঙ্গসুধা দিয়ে ভরি
তুলে নেবে মিলন-উৎসবে।
সূর্যাস্তের পথ দিয়ে যবে
সন্ধ্যাতারা উঠে আসে নক্ষত্রসভায়,
প্রহর না যেতে যেতে
কী সংকেতে
সব সঙ্গ ফেলে রেখে অস্তপথে ফিরে চলে যায়
সেও কি এমনি
শোনে পদধ্বনি।
তারে কি বিরহী
বলে কিছু দিগন্তের অন্তরালে রহি।

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি।
দিনশেষে
কম্পিত বক্ষের মাঝে এসে
কী শব্দে ডাকিছে কোন্ অজানা রজনী।

আণ্ডেস জাহাজ
২৪ অক্টোবর, ১৯২৪

প্রকাশ

খুঁজতে যখন এলাম সেদিন কোথায় তোমার গোপন অশ্রুজল,
সে-পথ আমায় দাও নি তুমি বলে।
বাহির দ্বারে অধীর খেলা, ভিড়ের মাঝে হাসির কোলাহল,
দেখে এলেম চলে।
এই ছবি মোর ছিল মনে—
নির্জন মন্দিরের কোণে
দিনের অবসানে
সন্ধ্যাপ্রদীপ আছে চেয়ে ধ্যানের চোখে সন্ধ্যাতারার পানে।
নিভৃত ঘর কাহার লাগি
নিশীথরাতে রইল জাগি,
খুলল না তার দ্বার।
হে চঞ্চলা, তুমি বুঝি
আপ্‌নিও পথ পাও নি খুঁজি,
তোমার কাছে সে ঘর অন্ধকার।

জানি, তোমার নিকুঞ্জে আজ পলাশশাখায় রঙের নেশা লাগে,
আপন গন্ধে বকুল মাতোয়ারা।
কাঙাল সুরে দখিনবাতাস বনে বনে গুপ্ত কী ধন মাগে,
বেড়ায় নিদ্রাহারা।
হায় গো তুমি জান না যে,
তোমার মনের তীর্থ-মাঝে
পূজা হয় নি আজো।
দেব্‌তা তোমার বুভুক্ষিত, মিথ্যা-ভূষায় কী সাজ তুমি সাজ'।
হল সুখের শয়ন পাতা,
কণ্ঠহারের মানিক গাঁথা,
প্রমোদরাতের গান,

হয় নি কেবল চোখের জলে
লুটিয়ে মাথা ধুলার তলে
আপনভোলা সকলশেষের দান।

ভোলাও যখন তখন সে কোন্ মায়ার ঢাকা পড়ে তোমার 'পরে ;
ভুলবে যখন তখন প্রকাশ পাবে—
উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আঁখির নীলাম্বরে
গভীর অনুভাবে।
ভোগ সে নহে, নয় বাসনা,
নয় আপনার উপাসনা,
নয়কো অভিমান—
সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাইরে যে তার নাই রে পরিমাণ।
আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখসাগরতীরে
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম-অপরূপ।

আণ্ডেস জাহাজ
২৬ অক্টোবর, ১৯২৪

শেষ

হে অশেষ, তব হাতে শেষ
ধরে কী অপূর্ব বেশ,
কী মহিমা।
জ্যোতির্হীন সীমা
মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি
যায় গলি,
গড়ে তোলে অসীমের অলংকার।
হয় সে অমৃতপাত্র সীমার ফুরালে অহংকার।
শেষের দীপালিরাত্রে, হে অশেষ,
অমা-অন্ধকাররন্ধ্রে দেখা যায় তোমার উদ্দেশ।

ভোরের বাতাসে
শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে—
তারাহারা রাত্রির বীণার
চরম ঝংকার।
যামিনীর তন্দ্রাহীন দীর্ঘ পথ ঘুরি
প্রভাত-আকাশে চন্দ্র করুণমাধুরী
শেষ করে যায় তার
উদয়সূর্যের পানে শান্ত নমস্কার।
যখন কর্মের দিন
ম্লান ক্ষীণ
গোষ্ঠে-চলা ধেনুসম সন্ধ্যার সমীরে
চলে ধীরে আঁধারের তীরে
তখন সোনার পাত্র হতে
কী অজস্র স্রোতে
তাহারে করাও স্নান অন্তিমের সৌন্দর্যধারায়

পূরবী

যখন বর্ষার মেঘ নিঃশেষে হারায়
বর্ষণের সকল সম্বল
শরতে শিশুর জন্ম দাও তারে শুভ্র সমুজ্জ্বল।—
হে অশেষ, তোমার অঙ্গনে
ভারমুক্ত তার সাথে ক্ষণে ক্ষণে
খেলায়ে রঙের খেলা,
ভাসায়ে আলোর ভেলা,
বিচিত্র করিয়া তোল তার শেষ বেলা।

ক্লান্ত আমি তারি লাগি, অন্তর তৃষিত—
কত দূরে আছে সেই খেলাভরা মুক্তির অমৃত।
বধূ যথা গোধূলিতে শেষ ঘট ভ'রে
বেণুচ্ছায়াঘন পথে অন্ধকারে ফিরে যায় ঘরে,
সেইমতো, হে সুন্দর, মোর অবসান
তোমার মাধুরী হতে
সুধাস্রোতে
ভরে নিতে চায় তার দিনান্তের গান।
হে ভীষণ, তব স্পর্শঘাত
অকস্মাৎ
মোর গূঢ় চিত্ত হতে কবে
চরম বেদনা-উৎস মুক্ত করি অগ্নিমহোৎসবে
অপূর্ণের যত দুঃখ, যত অসম্মান
উচ্ছ্বসিত রুদ্র হাস্যে করি দিবে শেষ দীপ্যমান

আণ্ডেস জাহাজ
২৯ অক্টোবর, ১৯২৪

দোসর

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,
সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি কেবল রইল বাকি-
সেই তো তোমার ডাকার বাঁধন অলখ ডোরে
দিনে দিনে বাঁধল মোরে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, সে ডাক তব
কত ভাষায় কয় যে কথা নব নব।
চমকে উঠে ছুটি যে তাই বাতায়নে,
সকল কাজে বাধা পড়ে, বসে থাকি আপন-মনে—
পারের পাখি আকাশে ধায় উধাও গানে,
চেয়ে থাকি তাহার পানে।

দোসর আমার, দোসর ওগো, যে বাতাসে
বসন্ত তার পুলক জাগায় ঘাসে ঘাসে,
ফুলফোটানো তোমার লিপি সেই কি আনে।
গুঞ্জরিয়া মর্মরিয়া কী বলে যায় কানে-কানে—
কে যেন তা বোঝে আমার বক্ষতলে,
ভাসে নয়ন অশ্রুজলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, কোন্ সুদূরে
ঘরছাড়া মোর ভাব্না-বাউল বেড়ায় ঘুরে।
তারে যখন শুধাই সে তো কয় না কথা,
নিয়ে আসে স্তব্ধ গভীর নীলাম্বরের নীরবতা—

একতারা তার বাজায় কভু গুন্‌গুনিয়ে,
রাত কেটে যায় তাই শুনিয়ে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, উঠল হাওয়া—
এবার তবে হোক আমাদের তরী বাওয়া।
দিনে দিনে পূর্ণ হল ব্যথার বোঝা,
তীরে তীরে ভাঙন লাগে, মিথ্যে কিসের বাসা খোঁজা—
একে একে সকল রশি গেছে খুলে,
ভাসিয়ে এবার দাও অকূলে।

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও-না দেখা—
সময় হল, একার সাথে মিলুক একা।
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়—
তোমায় আমায় নতুন পালা হোক-না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

আণ্ডেস জাহাজ
২৮ অক্টোবর, ১৯২৪

অবসান

পারের ঘাটা পাঠালো তরী ছায়ার পাল তুলে
আজি আমার প্রাণের উপকূলে।
মনের মাঝে কে কয় ফিরে ফিরে,—
বাঁশির সুরে ভরিয়া দাও গোধূলি-আলোটিরে।
সাঁঝের হাওয়া করুণ হোক দিনের অবসানে
পাড়ি দেবার গানে।

সময় যদি এসেছে তবে সময় যেন পাই,
নিভৃত খনে আপন-মনে গাই।
আভাস যত বেড়ায় ঘুরে মনে,
অশ্রুঘন কুহেলিকায় লুকায় কোণে কোণে—
আজিকে তারা পড়ুক ধরা, মিলুক পূরবীতে
একটি সংগীতে।

সন্ধ্যা মম, কোন্ কথাটি প্রাণের কথা তব—
আমার গানে, বলো, কী আমি কব
দিনের শেষে যে-ফুল পড়ে ঝ'রে
তাহারি শেষ নিশ্বাসে কি বাঁশিটি নেব ভরে।
অথবা ব'সে বাঁধিব সুর যে-তারা ওঠে রাতে
তাহারি মহিমাতে।

সন্ধ্যা মম, যে-পার হতে ভাসিল মোর তরী
গাব কি আজি বিদায়গান ওরি।
অথবা সেই অদেখা দূর পারে
প্রাণের চিরদিনের আশা পাঠাব অজানারে?
বলিব, যত হারানো বাণী তোমার রজনীতে
চলিনু খুঁজে নিতে।

আণ্ডেস জাহাজ
৩০ অক্টোবর, ১৯২৪

তারা

আকাশভরা তারার মাঝে আমার তারা কই।
ওই হবে কি ওই।
রাঙা আভার আভাস-মাঝে, সন্ধ্যারবির রাগে
সিন্ধুপারের ঢেউয়ের ছিটে ওই যাহারে লাগে,
ওই যে লাজুক আলোখানি, ওই যে গো নামহারা,
ওই কি আমার হবে আপন তারা।

জোয়ারভাঁটার স্রোতের টানে আমার বেলা কাটে
কেবল ঘাটে ঘাটে।
এমনি করে পথে পথে অনেক হল খোঁজা,
এমনি করে হাটে হাটে জমল অনেক বোঝা—
ইমনে আজ বাঁশি বাজে, মন যে কেমন করে
আকাশে মোর আপন তারার তরে।

দূরে এসে তার ভাষা কি ভুলেছি কোন্‌খনে।
পড়বে না কি মনে।
ঘরে ফেরার প্রদীপ আমার রাখল কোথায় জ্বেলে
পথে-চাওয়া করুণ চোখের কিরণখানি মেলে।
কোন্ রাতে যে মেটাবে মোর তপ্ত দিনের তৃষা,
খুঁজে খুঁজে পাব না তার দিশা?

ক্ষণে ক্ষণে কাজের মাঝে দেয় নি কি দ্বার নাড়া—
পাই নি কি তার সাড়া।
বাতায়নের মুক্তপথে স্বচ্ছ শরৎরাতে
তার আলোটি মেশে নি কি মোর স্বপনের সাথে।

পূরবী

হঠাৎ তারি সুরখানি কি ফাগুনহাওয়া বেয়ে
আসে নি মোর গানের 'পরে ধেয়ে।

কানে কানে কথাটি তার অনেক সুখে দুখে
বেজেছে মোর বুকে।
মাঝে মাঝে তারি বাতাস আমার পালে এসে
নিয়ে গেছে হঠাৎ আমায় আন্‌মনাদের দেশে—
পথহারানো বনের ছায়ায় কোন্‌ মায়াতে ভুলে
গেঁথেছি হার নাম-না-জানা ফুলে।

আমার তারার মন্ত্র নিয়ে এলেম ধরাতলে
লক্ষ্যহারার দলে।
বাসায় এল পথের হাওয়া, কাজের মাঝে খেলা,
ভাসল ভিড়ের মুখর স্রোতে একলা প্রাণের ভেলা-
বিচ্ছেদেরই লাগল বাদল মিলনঘন রাতে
বাঁধনহারা শ্রাবণধারাপাতে।

ফিরে যাবার সময় হল, তাই তো চেয়ে রই—
আমার তারা কই।
গভীর রাতে প্রদীপগুলি নিবেছে এই পারে,
বাসাহারা গন্ধ বেড়ায় বনের অন্ধকারে ;
সুর ঘুমালো নীরব নীড়ে, গান হল মোর সারা—
কোন্‌ আকাশে আমার আপন তারা।

আণ্ডেস জাহাজ
১ নভেম্বর, ১৯২৪

কৃতজ্ঞ

বলেছিনু "ভুলিব না", যবে তব ছলছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের 'পরে
কত নববসন্তের মাধবীমঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে; মধ্যাহ্নের কপোতকাকলি
তারি 'পরে ক্লান্ত ঘুম চাপা দিয়ে এল গেল চলি
কতদিন ফিরে ফিরে। তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জাভয়ে; তোমার সে হৃদয়ের স্বাক্ষরের 'পরে
চঞ্চল আলোকছায়া কত কাল প্রহরে প্রহরে
বুলায়ে গিয়েছে তুলি, কত সন্ধ্যা দিয়ে গেছে এঁকে
তারি 'পরে সোনার বিস্মৃতি, কত রাত্রি গেছে রেখে
অস্পষ্ট রেখার জালে আপনার স্বপনলিখন
তাহারে আচ্ছন্ন করি। প্রতি মুহূর্তটি প্রতি ক্ষণ
বাঁকাচোরা নানা চিত্রে চিন্তাহীন বালকের প্রায়
আপনার স্মৃতিলিপি চিত্তপটে এঁকে এঁকে যায়,
লুপ্ত করি পরস্পরে বিস্মৃতির জাল দেয় বুনে।
সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা কোরো তবে।

তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে ব'লে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজো নাই শেষ; রবির আলোক হতে একদিন
ধ্বনিয়া তুলেছে তার মর্মবাণী, বাজায়েছে বীন

পূরবী

তোমার আঁখির আলো। তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ-আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। ক্ষমা কোরো যদি ভুলে থাকি।
তবু জানি, একদিন তুমি মোরে নিয়েছিলে ডাকি
হৃদি-মাঝে ; আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে— সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন—
সব মানি— সব চেয়ে মানি, তুমি ছিলে একদিন।

আণ্ডেস জাহাজ

২ নভেম্বর, ১৯২৪

দুঃখসম্পদ

দুঃখ, তব যন্ত্রণায় যে-দুর্দিনে চিত্ত উঠে ভরি,
দেহে মনে চতুর্দিকে তোমার প্রহরী
রোধ করে বাহিরের সান্ত্বনার দ্বার,
সেইক্ষণে প্রাণ আপনার
নিগূঢ় ভাণ্ডার হতে গভীর সান্ত্বনা
বাহির করিয়া আনে ; অমৃতের কণা
গ'লে আসে অশ্রুজলে ;
সে-আনন্দ দেখা দেয় অন্তরের তলে
যে আপন পরিপূর্ণতায়
আপন করিয়া লয় দুঃখবেদনায়।
তখন সে মহা-অন্ধকারে
অনির্বাণ আলোকের পাই দেখা অন্তর-মাঝারে।
তখন বুঝিতে পারি, আপনার মাঝে
আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।

আণ্ডেস জাহাজ
৪ নভেম্বর, ১৯২৪

মৃত্যুর আহ্বান

জন্ম হয়েছিল তোর সকলের কোলে
আনন্দকল্লোলে।
নীলাকাশ, আলো, ফুল, পাখি,
জননীর আঁখি,
শ্রাবণের বৃষ্টিধারা, শরতের শিশিরের কণা—
প্রাণের প্রথম অভ্যর্থনা।
জন্ম সেই
এক নিমিষেই
অন্তহীন দান,
জন্ম সে যে গৃহ-মাঝে গৃহীরে আহ্বান।

মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নির্জনে,
হোক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে
গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্যছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছে ভেরী।
অজানা অরণ্যে যেথা উঠিতেছে উদাস মর্মর,
বিদেশের বিবাগি নির্ঝর
বিদায়গানের তালে হাসিয়া বাজায় করতালি।
যেথায় অপরিচিত নক্ষত্রের আরতির থালি
চলিয়াছে অনন্তের মন্দির-সন্ধানে,
পিছু ফিরে চাহিবার কিছু যেথা নাই কোনোখানে
দুয়ার রহিবে খোলা; ধরিত্রীর সমুদ্রপর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক্‌—
মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক।

আণ্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর, ১৯২৪

দান

কাঁকনজোড়া এনে দিলেম যবে
ভেবেছিলেম হয়তো খুশি হবে।
তুলে তুমি নিলে হাতের 'পরে,
ঘুরিয়ে তুমি দেখলে ক্ষণেক-তরে,
পরেছিলে হয়তো গিয়ে ঘরে,
হয়তো বা তা রেখেছিলে খুলে।
এলে যেদিন বিদায় নেবার রাতে
কাঁকনদুটি দেখি নাই তো হাতে,
হয়তো এলে ভুলে।

দেয় যে জনা কী দশা পায় তাকে।
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে।
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে।
বাতাসেতে উড়িয়ে-দেওয়া গানে
তারে কি আর স্মরণ করে পাখি।
দিতে যারা জানে এ সংসারে
এমন করেই তারা দিতে পারে
কিছু না রয় বাকি।

নিতে যারা জানে তারাই জানে,
বোঝে তারা মূল্যটি কোন্‌খানে।
তারাই জানে বুকের রত্নহারে
সেই মণিটি কজন দিতে পারে

পূরবী

হৃদয় দিয়ে দেখিতে হয় যারে—
যে পায় তারে পায় সে অবহেলে।
পাওয়ার মতন পাওয়া যারে কহে
সহজ বলেই সহজ তাহা নহে,
দৈবে তারে মেলে।

ভাবি যখন ভেবে না পাই, তবে
দেবার মতো কী আছে এই ভবে।
কোন্ খনিতে কোন্ ধনভাণ্ডারে,
সাগরতলে কিম্বা সাগরপারে,
যক্ষরাজের লক্ষমণির হারে
যা আছে তা কিছুই তো নয়, প্রিয়ে।
তাই তো বলি যা-কিছু মোর দান
গ্রহণ করেই করবে মূল্যবান
আপন হৃদয় দিয়ে।

আণ্ডেস জাহাজ
৩ নভেম্বর, ১৯২৪

সমাপন

এবারের মতো করো শেষ
প্রাণে যদি পেয়ে থাক চরমের পরম উদ্দেশ ;
যদি অবসান সুমধুর
আপন বীণার তারে সকল বেসুর
সুরে বেঁধে তুলে থাকে ;
অস্তরবি যদি তোরে ডাকে
দিনেরে মাভৈঃ ব'লে যেমন সে ডেকে নিয়ে যায়
অন্ধকার অজানায়,
সুন্দরের শেষ অর্চনায়
আপনার রশ্মিচ্ছটা সম্পূর্ণ করিয়া দেয় সারা ;
যদি সন্ধ্যাতারা
অসীমের বাতায়নতলে
শান্তির প্রদীপশিখা দেখায় কেমন ক'রে জ্বলে ;
যদি রাত্রি তার
খুলে দেয় নীরবের দ্বার,
নিয়ে যায় নিঃশব্দ সংকেতে ধীরে ধীরে
সকল বাণীর শেষ সাগরসংগমতীর্থতীরে ;
সেই শতদল হতে যদি গন্ধ পেয়ে থাক তার
মানসসরসে যাহা শেষ অর্ঘ্য, শেষ নমস্কার।

আণ্ডেস জাহাজ
৫ নভেম্বর, ১৯২৪

ভাবীকাল

ক্ষমা কোরো যদি গর্বভরে
মনে মনে ছবি দেখি— মোর কাব্যখানি লয়ে করে
দূর ভাবী শতাব্দীর অয়ি সপ্তদশী,
একেলা পড়িছ তব বাতায়নে বসি।
আকাশেতে শশী
ছন্দের ভরিয়া রন্ধ্র ঢালিছে গভীর নীরবতা
কথার অতীত সুরে পূর্ণ করি কথা;
হয়তো উঠিছে বক্ষ নেচে;
হয়তো ভাবিছ, "যদি থাকিত সে বেঁচে
আমারে বাসিত বুঝি ভালো।"
হয়তো বলিছ মনে, "সে নাহি আসিবে আর কভু,
তারি লাগি তবু
মোর বাতায়নতলে আজ রাত্রে জ্বালিলাম আলো।"

আণ্ডেস জাহাজ
৬ নভেম্বর, ১৯২৪

অতীত কাল

সেই ভালো, প্রতি যুগ আনে না আপন অবসান,
সম্পূর্ণ করে না তার গান ;
অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে।
তাই যবে পরযুগে বাঁশির উচ্ছ্বাসে
বেজে ওঠে গানখানি
তার মাঝে সুদূরের বাণী
কোথায় লুকায়ে থাকে, কী বলে সে বুঝিতে কে পারে ;
যুগান্তরের ব্যথা প্রত্যহের ব্যথার মাঝারে
মিলায় অশ্রুর বাষ্পজাল ;
অতীতের সূর্যাস্তের কাল
আপনার সকরুণ বর্ণচ্ছটা মেলে
মৃত্যুর ঐশ্বর্য দেয় ঢেলে,
নিমেষের বেদনারে করে সুবিপুল।
তাই বসন্তের ফুল
নাম-ভুলে-যাওয়া
প্রেয়সীর নিশ্বাসের হাওয়া
যুগান্তরসাগরের দ্বীপান্তর হতে বহি আনে।
যেন কী অজানা ভাষা মিশে যায় প্রণয়ীর কানে
পরিচিত ভাষাটির সাথে
মিলনের রাতে।

আণ্ডেস জাহাজ
৭ নভেম্বর, ১৯২৪

বেদনার লীলা

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।
যেখানে স্রোতের জল পীড়নের পাকে
আবর্তে ঘুরিতে থাকে,
সূর্যের কিরণ সেথা নৃত্য করে—
ফেনপুঞ্জ স্তরে স্তরে
দিবারাতি
রঙের খেলায় ওঠে মাতি।
শিশু রুদ্র হাসে খলখল,
দোলে টলমল
লীলাভরে।
প্রচণ্ডের সৃষ্টিগুলি প্রহরে প্রহরে
ওঠে পড়ে, আসে যায়, একান্ত হেলায়
নিরর্থ খেলায়।
গানগুলি সেইমতো বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।

আণ্ডেস জাহাজ
৭ নভেম্বর, ১৯২৪

শীত

শীতের হাওয়া হঠাৎ ছুটে এল
গানের বেলা শেষ না হতে হতে ?
মনের কথা ছড়িয়ে এলোমেলো
ভাসিয়ে দিল শুকনো পাতার স্রোতে।
মনের কথা যত
উজান তরীর মতো ;
পালে যখন হাওয়ার বলে
মরণপারে নিয়ে চলে,
চোখের জলের স্রোত যে তাদের টানে
পিছুঘাটের পানে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন-মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

ঘোরে তারা শুকনো পাতার পাকে
কাঁপনভরা হিমের বায়ুভরে।
ঝরা ফুলের পাপড়ি তাদের ঢাকে—
লুটায় কেন মরা ঘাসের 'পরে।
হল কি দিন সারা।
বিদায় নেবে তারা ?
এবার বুঝি কুয়াশাতে
লুকিয়ে তারা পোউষ-রাতে
ধুলার ডাকে সাড়া দিতে চলে
যেথায় ভূমিতলে
একলা তুমি, প্রিয়ে,
বসে আছ আপন-মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে ?

মন যে বলে, নয় কখনোই নয়—
ফুরায় নি তো, ফুরাবার এই ভান।
মন যে বলে, শুনি আকাশময়
যাবার মুখে ফিরে আসার গান।
শীর্ণ শীতের লতা
আমার মনের কথা
হিমের রাতে লুকিয়ে রাখে
নগ্ন শাখার ফাঁকে ফাঁকে,
ফাল্গুনেতে ফিরিয়ে দেবে ফুলে
তোমার চরণমূলে
যেথায় তুমি, প্রিয়ে,
একলা বসে আপন-মনে
আঁচল মাথায় দিয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১০ নভেম্বর, ১৯২৪

কিশোর-প্রেম

অনেক দিনের কথা সে যে অনেক দিনের কথা ;
পুরানো এই ঘাটের ধারে
ফিরে এল কোন্ জোয়ারে
পুরানো সেই কিশোর-প্রেমের করুণ ব্যাকুলতা।
সে যে অনেক দিনের কথা।

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন ;
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এল আমার অধরপারে
ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জন অঙ্গন।

তখন জানা ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা ;
যেন প্রথম দখিনবায়ে
শিহর লেগেছিল গায়ে ;
চাঁপাকুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন্ আশা—
সে যে অজানা কোন্ ভাষা।

সেই সেদিনের আসাযাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোখের চেয়ে-দেখা—
মনে পড়ে ভীরু হিয়ার না-বলা সেই বাণী—
সেই আধেক জানাজানি।

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুনমাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় দুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস—
আমার প্রথম ফাগুনমাস।

ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথা
আজকে আমার সুরে গানে
পায় খুঁজে তার গোপন মানে,
আজ বেদনায় উঠল ফুটে তার সেদিনের ব্যথা—
সেই শেষ-না-করা কথা।

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি—
আজ এসে মোর স্বপন-মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ই নভেম্বর, ১৯২৪

প্রভাত

স্বর্ণসুধাঢালা এই প্রভাতের বুকে
যাপিলাম সুখে,
পরিপূর্ণ অবকাশ করিলাম পান।
মুদিল অলস পাখা মুগ্ধ মোর গান।
যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশপদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।
যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলাভরে।
ধরণীর বক্ষ ভেদি যেথা হতে উঠিতেছে ধারা—
পুষ্পের ফোয়ারা,
তৃণের লহরী,
সেথানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি ;
ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি
সৌরভের স্রোতে।
ধূলি-উৎস হতে
প্রকাশের অক্লান্ত উৎসাহ,
জন্মমৃত্যুতরঙ্গিত রূপের প্রবাহ
স্পন্দিত করিছে মোর বক্ষস্থল আজি।
রক্তে মোর উঠে বাজি
তরঙ্গের অরণ্যের সম্মিলিত স্বর,
নিখিল মর্মর।
এ বিশ্বের স্পর্শের সাগর
আজ মোর সর্ব অঙ্গ করেছে মগন।
এই স্বচ্ছ উদার গগন
বাজায় অদৃশ্য শঙ্খ, শব্দহীন সুর।
আমার নয়নে মনে ঢেলে দেয় সুনীল সুদূর।

বুয়েনোস এয়ারিস
১১ নভেম্বর, ১৯২৪

বিদেশী ফুল

হে বিদেশী ফুল, যবে আমি পুছিলাম
"কী তোমার নাম",
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়।

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে বুকের কাছে ধরে
শুধালেম "বলো বলো মোরে
কোথা তুমি থাক",
হাসিয়া দুলালে মাথা, কহিলে, "জানি না, জানি নাকো।"
বুঝিলাম তবে
শুনিয়া কী হবে
থাক কোন্ দেশে।
যে তোমারে বোঝে ভালোবেসে
তাহার হৃদয়ে তব ঠাঁই,
আর কোথা নাই।

হে বিদেশী ফুল, আমি কানে কানে শুধানু আবার,
"ভাষা কী তোমার।"
হাসিয়া দুলালে শুধু মাথা,
চারিদিকে মর্মরিল পাতা।
আমি কহিলাম, "জানি, জানি,
সৌরভের বাণী
নীরবে জানায় তব আশা।
নিশ্বাসে ভরেছে মোর সেই তব নিশ্বাসের ভাষা।"

হে বিদেশী ফুল, আমি যেদিন প্রথম এনু ভোরে
শুধালেম, "চেন তুমি মোরে ?"
হাসিয়া দুলালে মাথা ; ভাবিলাম, তাহে একরতি
নাহি কারো ক্ষতি।
কহিলাম, "বোঝ নি কি তোমার পরশে
হৃদয় ভরেছে মোর রসে।
কেই বা আমারে চেনে এর চেয়ে বেশি,
হে ফুল বিদেশী।"

হে বিদেশী ফুল, যবে তোমারে শুধাই "বলো দেখি,
মোরে ভুলিবে কি।"
হাসিয়া দুলাও মাথা ; জানি জানি, মোরে ক্ষণে ক্ষণে
পড়িবে যে মনে।
দুই দিন পরে
চলে যাব দেশান্তরে,
তখন দূরের টানে স্বপ্নে আমি হব তব চেনা ;—
মোরে ভুলিবে না।

বুয়েনোস এয়ারিস
১২ নভেম্বর, ১৯২৪

অতিথি

প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূরদেশী পথিকেরে ; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা ; নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণগগনে
ঊর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরি বাণী,—
শুনিনু গম্ভীর স্বর, "তোমারে যে জানি মোরা জানি ;
আঁধারের কোল হতে যেদিন কোলেতে নিল ক্ষিতি
মোদের অতিথি তুমি, চিরদিন আলোর অতিথি।"
তেমনি তারার মতো মুখে মোর চাহিলে, কল্যাণী,
কহিলে তেমনি স্বরে, "তোমারে যে জানি আমি জানি।"
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,—
"প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।"

বুয়েনোস এয়ারিস
১৫ নভেম্বর, ১৯২৪

অন্তর্হিতা

প্রদীপ যখন নিবেছিল,
        আঁধার যখন রাতি,
দুয়ার যখন বন্ধ ছিল,
        ছিল না কেউ সাথি।
    মনে হল, অন্ধকারে
    কে এসেছে বাহিরদ্বারে—
মনে হল, শুনি যেন
        পায়ের ধ্বনি কার—
রাতের হাওয়ায় বাজল বুঝি
        কঙ্কণঝংকার।

বারেক শুধু মনে হল,
        খুলি, দুয়ার খুলি।
ক্ষণেকপরে ঘুমের ঘোরে
        কখন গেনু ভুলি।
    "কোন্ অতিথি দ্বারের কাছে
    একলা রাতে বসে আছে"
ক্ষণে ক্ষণে তন্দ্রা ভেঙে
        মন শুধালো যবে,
বলেছিলেম, "আর কিছু নয়,
        স্বপ্ন আমার হবে।"

মাঝ-গগনে সপ্ত-ঋষি
        স্তব্ধ গভীর রাতে
জানলা হতে আমায় যেন
        ডাকল ইশারাতে।

মনে হল, শয়ন ফেলে
দিই-না কেন আলো জ্বেলে-
আলসভরে রইনু শুয়ে
হল না দীপ জ্বালা।
প্রহর-পরে কাটল প্রহর,
বন্ধ রইল তালা।

জাগল কখন দখিনহাওয়া,
কাঁপল বনের হিয়া,
স্বপ্নে-কথা-কওয়ার মতো
উঠল মর্মরিয়া।
যূথীর গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে
মূর্ছিল মোর বাতায়নে,
শিহর দিয়ে গেল আমার
সকল অঙ্গ চুমে।
জেগে উঠে আবার কখন
ভরল নয়ন ঘুমে।

ভোরের তারা পুবগগনে
যখন হল গত
বিদায়রাতির একটি ফোঁটা
চোখের জলের মতো,
হঠাৎ মনে হল তবে,
যেন কাহার করুণ রবে
শিরীষফুলের-গন্ধে-আকুল
বনের বীথি ব্যেপে
শিশিরভেজা তৃণগুলি
উঠল কেঁপে কেঁপে।

শয়ন ছেড়ে উঠে তখন
খুলে দিলেম দ্বার—
হায় রে, ধুলায় বিছিয়ে গেছে
যূথীর মালা কার।
ঐ যে দূরে, নয়ন নত,
বনের ছায়ায় ছায়ার মতো
মায়ার মতো মিলিয়ে গেল
অরুণ-আলোয় মিশে,
ঐ বুঝি মোর বাহিরদ্বারের
রাতের অতিথি সে।

আজ হতে মোর ঘরের দুয়ার
রাখব খুলে রাতে।
প্রদীপখানি রইবে জ্বালা
বাহির-জানালাতে।
আজ হতে কার পরশ-লাগি
পথ তাকিয়ে রইব জাগি;
আর কোনোদিন আসবে না কি
আমার পরান ছেয়ে
যূথীর মালার গন্ধখানি
রাতের বাতাস বেয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১৬ নভেম্বর, ১৯২৪

আশঙ্কা

ভালোবাসার মূল্য আমায় দু হাত ভরে
যতই দেবে বেশি করে
ততই আমার অন্তরের এই গভীর ফাঁকি
আপনি ধরা পড়বে না কি।
তাহার চেয়ে ঋণের রাশি রিক্ত করি
যাই-না নিয়ে শূন্য তরী।
বরং রব ক্ষুধায় কাতর ভালো সেও,
সুধায়-ভরা হৃদয় তোমার
ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেয়ো।

পাছে আমার আপন ব্যথা মিটাইতে
ব্যথা জাগাই তোমার চিতে,
পাছে আমার আপন বোঝা লাঘব-তরে
চাপাই বোঝা তোমার 'পরে,
পাছে আমার একলা প্রাণের ক্ষুব্ধ ডাকে
রাত্রে তোমায় জাগিয়ে রাখে,
সেই ভয়েতেই মনের কথা কই নে খুলে—
ভুলতে যদি পার তবে
সেই ভালো গো, যেয়ো ভুলে।

বিজন পথে চলেছিলেম, তুমি এলে
মুখে আমার নয়ন মেলে।
ভেবেছিলেম বলি তোমায়, সঙ্গে চলো,
আমায় কিছু কথা বলো।

হঠাৎ তোমার মুখে চেয়ে কী কারণে
ভয় হল যে আমার মনে।
দেখেছিলেম, সুপ্ত আগুন লুকিয়ে জ্বলে
তোমার প্রাণের নিশীথরাতের
অন্ধকারের গভীর তলে।

তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি,
তবে যে সেই দীপ্ত আলোয় আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।
হবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কী মোর আছে দিতে।
তাই তো আমি বলি তোমায় নতশিরে,
তোমার দেখার স্মৃতি নিয়ে
একলা আমি যাব ফিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১৭ নভেম্বর, ১৯২৪

শেষ বসন্ত

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মতো
বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।
তোমার কাননতলে ফাল্গুন আসিবে বারম্বার,
তাহারি একটি শুধু মাগি আমি দুয়ারে তোমার।

বেলা কবে গিয়াছে বৃথাই
এতকাল ভুলে ছিনু তাই।
হঠাৎ তোমার চোখে
দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে,
আমার সময় আর নাই।
তাই আমি একে একে গণিতেছি কৃপণের সম
ব্যাকুল সংকোচভরে বসন্তশেষের দিন মম।

ভয় রাখিয়ো না তুমি মনে;
তোমার বিকচ ফুলবনে
দেরি করিব না মিছে,
ফিরে চাহিব না পিছে
দিনশেষে বিদায়ের ক্ষণে।
চাব না তোমার চোখে আঁখিজল পাব আশা করি
রাখিবারে চিরদিন স্মৃতিরে করুণারসে ভরি।

ফিরিয়া যেয়ো না, শোনো শোনো,
সূর্য অস্ত যায় নি এখনো।
সময় রয়েছে বাকি;
সময়েরে দিতে ফাঁকি

ভাবনা রেখো না মনে কোনো।
পাতার আড়াল হতে বিকালের আলোটুকু এসে
আরো কিছুখন ধরে ঝলুক তোমার কালো কেশে।

হাসিয়ো মধুর উচ্চহাসে
অকারণ নির্মম উল্লাসে,
বনসরসীর তীরে
ভীরু কাঠবিড়ালিরে
সহসা চকিত কোরো ত্রাসে।
ভুলে-যাওয়া কথাগুলি কানে কানে করায়ে স্মরণ
দিব না মন্থর করি ওই তব চঞ্চল চরণ।

তার পরে যেয়ো তুমি চলে
ঝরা পাতা দ্রুতপদে দলে,
নীড়ে-ফেরা পাখি যবে
অস্ফুট কাকলিরবে
দিনান্তেরে ক্ষুব্ধ করি তোলে।
বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায় তোমার ছবি দূরে
মিলাইবে গোধূলির বাঁশরির সর্বশেষ সুরে।

রাত্রি যবে হবে অন্ধকার
বাতায়নে বসিয়ো তোমার।
সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে-গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।

বুয়েনোস এয়ারিস
২১ নভেম্বর, ১৯২৪

বিপাশা

মায়ামৃগী, নাই বা তুমি
পড়লে প্রেমের ফাঁদে।
ফাগুনরাতে চোরা মেঘে
নাই হরিল চাঁদে।
বাঁধনকাটা ভাব্‌না তোমার
হাওয়ায় পাখা মেলে,
দেহমনে চঞ্চলতার
নিত্য যে ঢেউ খেলে।
ঝরনাধারার মতো সদাই
মুক্ত তোমার গতি,
নাই বা নিলে তটের শরণ
তায় বা কিসের ক্ষতি।
শরৎপ্রাতের মেঘ যে তুমি
শুভ্র আলোয় ধোওয়া,
একটুখানি অরুণ-আভার
সোনার-হাসি-ছোঁওয়া ;
শূন্যপথে মনোরথে
ফেরো আকাশপার,
বুকের মাঝে নাই বহিলে
অশ্রুজলের ভার।

এমনি করেই যাও খেলে যাও
অকারণের খেলা;
ছুটির স্রোতে যাক্‌-না ভেসে
হালকা খুশির ভেলা।

পথে চাওয়ার ক্লান্তি কেন
        নামবে আঁখির পাতে,
কাছের সোহাগ ছাড়বে কেন
        দূরের দুরাশাতে ;
তোমার পায়ের নূপুরখানি
        বাজাক নিত্যকাল
অশোকবনের চিকন পাতার
        চমক-আলোর তাল।
রাতের গায়ে পুলক দিয়ে
        জোনাক যেমন জ্বলে
তেমনি তোমার খেয়ালগুলি
        উড়ুক স্বপনতলে।
যারা তোমার সঙ্গকাঙাল
        বাইরে বেড়ায় ঘুরে
ভিড় যেন না করে তোমার
        মনের অন্তঃপুরে।

সরোবরের পদ্ম তুমি,
        আপন চারিদিকে
মেলে রেখো তরল জলের
        সরল বিম্বটিকে।
গন্ধ তোমার হোক-না সবার,
        মনে রেখো তবু—
বৃন্ত যেন চুরির ছুরি
        নাগাল না পায় কভু।
আমার কথা শুধাও যদি—
        চাবার তরেই চাই,

পাবার তরে চিত্তে আমার
ভাব্‌না কিছুই নাই।
তোমার পানে নিবিড় টানের
বেদনভরা সুখ
মনকে আমার রাখে যেন
নিয়ত উৎসুক।
চাই না তোমায় ধরতে আমি
মোর বাসনায় ঢেকে—
আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও,
নয় খাঁচাটার থেকে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২২ নভেম্বর, ১৯২৪

চাবি

বিধাতা যেদিন মোর মন
করিলা সৃজন
বহু-কক্ষে-ভাগ-করা হর্ম্যের মতন,
শুধু তার বাহিরের ঘরে
প্রস্তুত রহিল সজ্জা নানামতো অতিথির তরে ;
নীরব নির্জন অন্তঃপুরে
তালা তার বন্ধ করি চাবিখানি ফেলি দিলা দূরে।
মাঝে মাঝে পান্থ এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
বলিয়াছে "খুলে দাও" ; উপায় জানি না খুলিবারে।
বাহিরে আকাশ তাই ধুলায় আকুল করে হাওয়া ;
সেখানেই যত খেলা, যত মেলা, যত আসাযাওয়া।

অন্তরের জনহীন পথে
হিমে-ভেজা ঘাসে ঘাসে শেফালিকা লুটায় শরতে।
আষাঢ়ের আর্দ্র বায়ুভরে
কদম্বকেশরে
চিহ্ন তার পড়ে ঢাকা।
চৈত্রে সে বিচিত্র বর্ণে কুসুমের আলিম্পনে আঁকা।
সেথায় লাজুক পাখি ছায়াঘন শাখে,
মধ্যাহ্নে করুণ কণ্ঠে উদাসীন প্রেয়সীরে ডাকে।
সন্ধ্যাতারা দিগন্তের কোণে
শিরীষপাতার ফাঁকে কান পেতে শোনে
যেন কার পদধ্বনি দক্ষিণবাতাসে।
ঝরাপাতা-বিছানো সে ঘাসে
বাঁশরি বাজাই আমি কুসুমসুগন্ধি অবকাশে।

দূরে চেয়ে থাকি একা—
মনে করি, যদি কভু পাই তার দেখা
যে-পথিক একদিন অজানা সমুদ্র-উপকূলে
কুড়ায়ে পেয়েছে চাবি ; বক্ষে নিয়ে তুলে
শুনিতে পেয়েছে যেন অনাদি কালের কোন্ বাণী
সেই হতে ফিরিতেছে বিরাম না জানি।
অবশেষে
মৌমাছির পরিচিত এ নিভৃত পথপ্রান্তে এসে
যাত্রা তার হবে অবসান ;
খুলিবে সে গুপ্তদ্বার কেহ যার পায় নি সন্ধান।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৬ নভেম্বর, ১৯২৪

বৈতরণী

ওগো বৈতরণী,
তরল খড়্গের মতো ধারা তব, নাই তার ধ্বনি,
নাই তার তরঙ্গভঙ্গিমা ;
নাই রূপ, নাই স্পর্শ, ছন্দে তার নাই কোনো সীমা ;
অমাবস্যারজনীর
সুপ্তিসুগম্ভীর
মৌনী প্রহরের মতো .
নিরাকার পদচারে শূন্যে শূন্যে ধায় অবিরত।
প্রাণের অরণ্যতট হতে
দণ্ড পল খসে খসে পড়ে তব অন্ধকারস্রোতে।
রূপের না থাকে চিহ্ন, নাহি থাকে বর্ণের বর্ণনা,
বাণীর না থাকে এক কণা।

ওগো বৈতরণী,
কতবার খেয়ার তরণী
এসেছিল এই ঘাটে আমার এ বিশ্বের আলোতে।
নিয়ে গেল কালহীন তোমার কালোতে
কত মোর উৎসবের বাতি,
আমার প্রাণের আশা, আমার গানের কত সাথি—
দিবসেরে রিক্ত করি', তিক্ত করি' আমার রাত্রিরে।
সেই হতে চিত্ত মোর নিয়েছে আশ্রয় তব তীরে।

ওগো বৈতরণী
অদৃশ্যের উপকূলে থেমে গেছে যেথায় ধরণী
সেথায় নির্জনে,
দেখি আমি আপনার মনে,

তোমার অরূপতলে সব রূপ পূর্ণ হয়ে ফুটে,
সব গান দীপ্ত হয়ে উঠে
শ্রবণের পরপারে
তব নিঃশব্দের কণ্ঠহারে।
যে-সুন্দর বসেছিল মোর পাশে এসে
ক্ষণিকের ক্ষীণ ছদ্মবেশে,
যে চিরমধুর
দ্রুতপদে চলে গেল নিমেষের বাজায়ে নূপুর,
প্রলয়ের অন্তরালে গাহে তারা অনন্তের সুর।
চোখের জলের মতো
একটি বর্ষণে যারা হয়ে গেছে গত
চিত্তের নিশীথরাত্রে গাঁথে তারা নক্ষত্রমালিকা—
অনির্বাণ আলোকেতে সাজায় অক্ষয় দীপালিকা।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৭ নভেম্বর, ১৯২৪

প্রভাতী

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
খনে খনে এসে চলে যাও থাকি থাকি।
হৃদয়কমল টুটিয়া সকল বন্ধ
বাতাসে বাতাসে মেলি দেয় তার গন্ধ.
তোমারে পাঠায় ডাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

যেথায় তাহার গোপন সোনার রেণু
সেথা বাজে তার বেণু ;
বলে, এসো, এসো, লও খুঁজে লও মোরে,
মধুসঞ্চয় দিয়ো না ব্যর্থ করে,
এসো এ বক্ষমাঝে—
কবে হবে দিন আঁধারে-বিলীন সাঁঝে।

দেখো চেয়ে কোন্ উতলা পবনবেগে
সুরের আঘাত লেগে
মোর সরোবরে জলতল ছলছলি
এপারে ওপারে করে কী যে বলাবলি,
তরঙ্গ উঠে জেগে।
গিয়েছে আঁধার গোপনে-কাঁদার রাতি,
নিখিল ভুবন হেরো কী আশায় মাতি
আছে অঞ্জলি পাতি।

হেরো গগনের নীল শতদলখানি
মেলিল নীরব বাণী

অরুণপক্ষ প্রসারি সকৌতুকে
সোনার ভ্রমর আসিল তাহার বুকে
কোথা হতে নাহি জানি।

চপল ভ্রমর, হে কালো কাজল আঁখি,
এখনো তোমার সময় আসিল না কি।
মোর রজনীর ভেঙেছে তিমিরবাঁধ,
পাও নি কি সংবাদ।
জেগে-ওঠা প্রাণে উথলিছে ব্যাকুলতা,
দিকে দিকে আজি রটে নি কি সে-বারতা।
শোন নি কী গাহে পাখি,
হে কালো কাজল আঁখি।

শিশিরশিহরা পল্লব ঝলমল,
বেণুশাখাগুলি খনে খনে টলমল,
অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল—
কিছু না রহিল বাকি।
এল যে আমার মন-বিলাবার বেলা,
খেলিব এবার সব-হারাবার খেলা,
যা-কিছু দেবার রাখিব না আর ঢাকি,
হে কালো কাজল আঁখি।

বুয়েনোস এয়ারিস
১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

মধু

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।
সে তো কভু পায় না সন্ধান
কোথা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান।
তাহার শ্রবণ ভরে
আপন গুঞ্জনস্বরে,
হারায় সে নিখিলের গান।

জানে না ফুলের গন্ধে আছে কোন্ করুণ বিষাদ,
সে জানে তা সংগ্রহের পথের সংবাদ।
চাহে নি সে অরণ্যের পানে,
লতার লাবণ্য নাহি জানে,
পড়ে নি ফুলের বর্ণে বসন্তের মর্মবাণী লেখা।
মধুকণা লক্ষ্য তার, তারি কক্ষ আছে শুধু শেখা।

পাখির মতন মন শুধু উড়িবার সুখ চাহে
উধাও উৎসাহে;
আকাশের বক্ষ হতে ডানা ভরি তার
স্বর্ণ-আলোকের মধু নিতে চায় নাহি যার ভার,
নাহি যার ক্ষয়,
নাহি যার নিরুদ্ধ সঞ্চয়,
যার বাধা নাই,
যারে পাই তবু নাহি পাই—
যার তরে নহে লোভ, নহে ক্ষোভ, নহে তীক্ষ্ণ রিষ,
নহে শূল, নহে গুপ্ত বিষ।

বুয়েনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

তৃতীয়া

কাছের থেকে দেয় না ধরা, দূরের থেকে ডাকে
তিন বছরের প্রিয়া আমার— দুঃখ জানাই কাকে।
কণ্ঠেতে ওর দিয়ে গেছে দখিন হাওয়ার দান
তিন বসন্তে দোয়েল শ্যামার তিন বছরের গান।
তবু কেন আমারে ওর এতই কৃপণতা—
বারেক ডেকে দৌড়ে পালায়, কইতে না চায় কথা।
তবু ভাবি, যাই কেন হোক, অদৃষ্ট মোর ভালো—
অমন সুরে ডাকে আমার মানিক, আমার আলো।
কপাল মন্দ হলে টানে আরো নিচের তলায়;
হৃদয়টি ওর হোক-না কঠোর, মিষ্টি তো ওর গলায়।

আলো যেমন চমকে বেড়ায় আমলকির ঐ গাছে
তিন বছরের প্রিয়া আমার দূরের থেকে নাচে।
লুকিয়ে কখন বিলিয়ে গেছে বনের হিল্লোল
অঙ্গে উহার বেণুশাখার তিন ফাগুনের দোল।
তবু ক্ষণিক হেলাভরে হৃদয় করি লুট
শেষ না হতেই নাচের পালা কোন্‌খানে দেয় ছুট।
আমি ভাবি এই বা কী কম, প্রাণে তো ঢেউ তোলে—
ওর মনেতে যা-হয় তা হোক, আমার তো মন দোলে।
হৃদয় না-হয় নাই বা পেলাম, মাধুরী পাই নাচে—
ভাবের অভাব রইল না-হয়, ছন্দটা তো আছে।

বন্দী হতে চাই যে কোমল ঐ বাহুবন্ধনে,
তিন বছরের প্রিয়ার আমার নাই সে খেয়াল মনে।
সোনার প্রভাত দিয়েছে ওর সর্বদেহ ছুঁয়ে
শিউলিফুলের তিন শরতের পরশ দিয়ে ধুয়ে।
বুঝতে নারি আমার বেলায় কেন টানাটানি;
ক্ষয় নাহি যার সেই সুধা নয় দিত একটুখানি।

তবু ভাবি, বিধি আমায় নিতান্ত নয় বাম—
মাঝে মাঝে দেয় সে দেখা, তারই কি কম দাম।
পরশ না পাই, হরষ পাব চোখের চাওয়া চেয়ে—
রূপের ঝোরা বইবে আমার বুকের পাহাড় বেয়ে।

কবি ব'লে লোকসমাজে আছে তো মোর ঠাঁই,
তিন বছরের প্রিয়ার কাছে কবির আদর নাই।
জানে না যে, ছন্দে আমার পাতি নাচের ফাঁদ,
দোলার টানে বাঁধন মানে দূর আকাশের চাঁদ।
পলাতকার দল যত সব দখিন হাওয়ার চেলা
আপনি তারা বশ মেনে যায় আমার গানের বেলা।
ছোট্টো ওরই হৃদয়খানি দেয় না শুধু ধরা,
ঝগড়ু বোকার বরণমালা গাঁথে স্বয়ম্বরা।
যখন দেখি এমন বুদ্ধি, এমন তাহার রুচি,
আমারে ওর পছন্দ নয়, যায় সে লজ্জা ঘুচি।

এমন দিনও আসবে আমার, আছি সে-পথ চেয়ে,
তিন বছরের প্রিয়া হবেন বিশ বছরের মেয়ে।
স্বর্গভোলা পারিজাতের গন্ধখানি এসে
খেপা হাওয়ায় বুকের ভিতর ফিরবে ভেসে ভেসে।
কথায় যারে যায় না ধরা এমন আভাস যত
মর্মরিবে বাদলরাতের রিমিঝিমির মতো।
সৃষ্টিছাড়া ব্যথা যত নাই যাহাদের বাসা,
ঘুরে ঘুরে গানের সুরে খুঁজবে আপন ভাষা।
দেখবে তখন ঝগড়ু বোকা কী করতে বা পারে,
শেষকালে সেই আসতে হবেই এই কবিটির দ্বারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

অদেখা

আসিবে সে, আছি সেই আশাতে।
শোন নি কি, স্বজনাকে
নাম ধরে ওই ডাকে
নিশিদিন আকাশের ভাষাতে।
সুর বুকে আসে ভাসি,
পথ চেনাবার বাঁশি
বাজে কোন্ ওপারের বাসাতে।
ফুল ফোটে বনতলে,
ইশারায় মোরে বলে
"আসিবে সে" ; আছি সেই আশাতে।

এল না তো, এখনো সে এল না।
আলো-আঁধারের ঘোরে
যে-ডাক শুনিনু ভোরে
সে শুধু স্বপন, সে কি ছলনা।
হায়, বেড়ে যায় বেলা,
কবে শুরু হবে খেলা,
সাজায়ে বসিয়া আছি খেলনা—
কিছু ভালো, কিছু ভাঙা,
কিছু কালো, কিছু রাঙা,
যারে নিয়ে খেলা সে তো এল না।

আসে নি তো, এখনো সে আসে নি
ভেবেছিনু আসে যদি,
পাড়ি দেব ভরা নদী—
বসে আছি, আজো তরী ভাসে নি।

পূরবী

মিলায় সিঁদুর আলো,
গোধূলি সে হয় কালো—
কোথা সে স্বপনবন-বাসিনী।
মালতীর মালাগাছি
কোলে নিয়ে বসে আছি,
যারে দেব এখনো সে আসে নি।

এসেছে সে, মন বলে, এসেছে।
সুবাস-আভাসখানি,
মনে হয় যেন জানি,
রাতের বাতাসে আজ ভেসেছে।
বুঝিয়াছি অনুভবে,
বনমর্ম্মররবে
সে তার গোপন হাসি হেসেছে।
অদেখার পরশেতে
আঁধার উঠেছে মেতে—
মন জানে, এসেছে সে এসেছে।

বুয়েনোস এয়ারিস
৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

চঞ্চল

হায় রে তোরে রাখব ধরে,
ভালোবাসা,
মনে ছিল এই দুরাশা।
পাথর দিয়ে ভিত্তি ফেঁদে
বাসা যে তোর দিলেম বেঁধে,
এল তুফান সর্বনাশা।
মনে আমার ছিল যে রে
ঘিরব তোরে হাসির ঘেরে,
চোখের জলে হল ভাসা।
অনেক দুঃখে গেছে বোঝা—
বেঁধে রাখা নয় তো সোজা,
সুখের ভিতে নহে তোমার
অচল বাসা।

এবার আমি সবফুরানো
পথের শেষে
বাঁধব বাসা মেঘের দেশে
ক্ষণে ক্ষণে নিত্যনব
বদল কোরো মূর্তি তব
রঙফেরানো মায়ার বেশে।
কখনো বা জ্যোৎস্নাভরা
কখনো বা বাদলঝরা
খেয়াল তোমার কেঁদে হেসে।
যেই হাওয়াতে হেলাভরে
মিলিয়ে যাবে দিগন্তরে
সেই হাওয়াতেই ফিরে ফিরে
আসবে ভেসে।

পূরবী

কঠিন মাটি বানের জলে
যায় যে বয়ে,
শৈলপাষাণ যায় তো খয়ে
কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্বভরে
থাকতে যে চায় অচল হয়ে।
জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তারা—
হারায় যারা রয়ে রয়ে।
ভালোবাসা, তোমারে তাই
মরণ দিয়ে বরিতে চাই—
চঞ্চলতার লীলা তোমার
রইব সয়ে।

বুয়েনোস এয়ারিস
১০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

প্রবাহিনী

দুর্গম দূর শৈলশিরের
স্তব্ধ তুষার নই তো আমি,
আপ্‌নাহারা ঝরনাধারা
ধূলির ধরায় যাই যে নামি।
সরোবরের গম্ভীরতায়
ফেনিল নাচের মাতন ঢালি,
অচল শিলার ভ্রূভঙ্গিমায়
বাজাই চপল করতালি।
মন্দ্রসুরের মন্ত্র শুনাই
গভীর গুহার আঁধারতলে,
গহন বনের ভাঙাই ধেয়ান
উচ্চহাসির কোলাহলে।
শুভ্র ফেনের কুন্দমালায়
বিন্ধ্যগিরির বক্ষ সাজাই,
যোগীশ্বরের জটার মধ্যে
তরঙ্গিণীর নূপুর বাজাই।
বৃদ্ধ বটের লুব্ধ শিকড়
আমার বেণী ধরিতে চায়,
সূর্যকিরণ শিশুর মতন
অঙ্ক আমার ভরিতে চায়।
নাই কোনো মোর ভয়ভাবনা,
নাই কোনো মোর অচল রীতি
গতি আমার সকল দিকেই,
শুভ আমার সকল তিথি।

পূরবী

বক্ষে আমার কাঁদোর ধারা,

আলোর ধারা আমার চোখে।

স্বর্গে আমার সুর চলে যায়,

নৃত্য আমার মর্ত্তলোকে।

অশ্রুহাসির যুগলধারা

ছোটে আমার ডাইনে বামে।

অচল গানের সাগর-মাঝে

চপল গানের যাত্রা থামে।

বুয়েনোস এয়ারিস

১১ ডিসেম্বর, ১৯২৪

আকন্দ

সন্ধ্যা-আলোর সোনার খেয়া পাড়ি যখন দিল গগনপারে
অকূল অন্ধকারে,
ছম্‌ছমিয়ে এল রাতি ভুবনডাঙার মাঠে
একলা আমি গোয়ালপাড়ার বাটে।
নতুনফোটা গানের কুঁড়ি দেব বলে দিনুর হাতে আনি
মনে নিয়ে সুরের গুন্‌গুনানি
চলেছিলেম, এমন সময় যেন সে কোন্ পরীর কণ্ঠখানি
বাতাসেতে বাজিয়ে দিল বিনা-ভাষার বাণী,
বললে আমায়, "দাঁড়াও ক্ষণেক-তরে,
ওগো পথিক, তোমার লাগি চেয়ে আছি যুগে যুগান্তরে।
আমায় নেবে চিনে,
সেই সুলগন এল এতদিনে।
পথের ধারে দাঁড়িয়ে আমি, মনে গোপন আশা,
কবির ছন্দে বাঁধব আমার বাসা।"
দেখা হল, চেনা হল সাঁঝের আঁধারেতে,
বলে এলেম, "তোমার আসন কাব্যে দেব পেতে।"

সেই কথা আজ পড়ল মনে হঠাৎ হেথায় এসে
সাগরপারের দেশে;
মন-কেমনের হাওয়ার পাকে অনেক স্মৃতি বেড়ায় মনে ঘুরে,
তারই মধ্যে বাজল করুণ সুরে,
"ভুলো না গো ভুলো না এই পথ-বাসিনীর কথা,
আজো আমি দাঁড়িয়ে আছি, বাসা আমার কোথা।"
শপথ আমার, তোমরা বোলো তারে,
তার কথাটি দাঁড়িয়েছিল মনের পথের ধারে;
বোলো তারে, চোখের দেখা ফুটেছে আজ গানে—
লিখনখানি রাখিনু এইখানে।—

কঙ্কাল

পশুর কঙ্কাল ওই মাঠের পথের একপাশে
পড়ে আছে ঘাসে —
যে-ঘাস একদা তারে দিয়েছিল বল,
দিয়েছিল বিশ্রাম কোমল।

পড়ে আছে পাণ্ডু অস্থিরাশি,
কালের নীরস অট্টহাসি।
সে যেন রে মরণের অঙ্গুলিনির্দেশ
ইঙ্গিতে কহিছে মোরে, একদা পশুর যেথা শেষ,
সেথায় তোমারও অন্ত, ভেদ নাহি লেশ।
তোমারও প্রাণের সুরা ফুরাইলে পরে
ভাঙা পাত্র পড়ে রবে অমনি ধুলায় অনাদরে।

আমি বলিলাম, "মৃত্যু, করি না বিশ্বাস
তব শূন্যতার উপহাস।
মোর নহে শুধুমাত্র প্রাণ
সর্ব বিত্ত রিক্ত করি যার হয় যাত্রা অবসান ;
যাহা ফুরাইলে দিন
শূন্য অস্থি দিয়ে শোধে আহারনিদ্রার শেষ ঋণ।
ভেবেছি জেনেছি যাহা, বলেছি শুনেছি যাহা কানে,
সহসা গেয়েছি যাহা গানে,
ধরে নি তা মরণের বেড়াঘেরা প্রাণে ;
যা পেয়েছি, যা করেছি দান
মর্তে তার কোথা পরিমাণ।

আমার মনের নৃত্য কতবার জীবনমৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।
চিরকাল-তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কঙ্কালের সীমানায় এসে।
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়;
পদাঘাতে জীর্ণ তারে নাহি করে দণ্ডপলগুলি,
সর্বস্বান্ত নাহি করে পথপ্রান্তে ধূলি।

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপমধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধারপ্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস—
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।"

চাপাড মালাল
১৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

চিঠি

শ্রীমান দ্বিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু,

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজল কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আতিপাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলাদেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এইদেশি ইস্পানি।
প্রকাশ্যে তার থাক্-না যতই সাদা মুখের ঢঙ,
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ।
হেথায় মুখর ফুলের হাটে আছে কি তার দাম।
চারুকণ্ঠে ঠাঁই নাহি তার, ধুলায় পরিণাম।

যূথী বলে, "আতিথ্য লও, একটুখানি বোসো।"
আমি বলি চমকে উঠে, আরে রোসো, রোসো;
জিতবে গন্ধ, হারবে কি গান। নৈব কদাচিৎ।
তাড়াতাড়ি গান রচিলাম; জানি নে কার জিত।
তিনটে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদ্যমান।
এই বিরহীর কথা স্মরি গেয়ো সেদিন, দিনু,
জুঁইবাগানের আরেক দিনের গান যা রচেছিনু।

ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশে গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ-দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।

এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম, শুনছি দার্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিস বাজায় শিঙে।

জানি তুমি বলবে আমায়, "থামো একটুখানি,
বেণু বীণার লগ্ন এ নয়, শিকল ঝম্‌ঝমানি।"
শুনে আমি রাগব মনে, কোরো না সেই ভয়,
সময় আমার আছে বলেই এখন সময় নয়।
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তারা তো নয় ফাঁকি,
গিলটিকরা তক্‌মাঝোলা নয় তাহাদের থাকি।
কপাল জুড়ে নেই তো তাদের পালোয়ানের টিকা,
তাদের তিলক নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা।
যেদিন ভবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা,
সেদিনও তো সাজাবে জুঁই দেবার্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোয় যারা
লড়বে তারা চিরটা কাল? গড়বে পাষাণকারা?
রাজপ্রতাপের দম্ভ সে তো এক দমকের বায়ু,
সবুর করতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু।
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে।
আজ আছে কাল নাই ব'লে তাই তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি,
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চারঘুড়ি।
তাই তো প্রেমের মাল্য গাঁথার নাইকো অবকাশ—
হাতকড়ারই কড়াক্কড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।

শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে,
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উলটো দিকের পথে।
জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তর সহে না তবু—
ধর্মেরে যায় ঠেলা মেরে গায়ের-জোরের প্রভু।
রক্তরঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ির বীজে,
বিনাশ তারে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।
বাহুর দম্ভ, রাহুর মতো, একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগরে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হয়েছে এই খেলা;
নতুন রাহু ভাবে তবু, "হবে না মোর বেলা।"
কাণ্ড দেখে পশুপক্ষী ফুকরে ওঠে ভয়ে,
অনন্তদেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে।

টুটল কত বিজয়তোরণ, লুটল প্রাসাদচুড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হল গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্বদুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙিন কুর্তি, সঙিন মূর্তি, রইবে না কিচ্ছুই;
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।
ভাঙবে শিকল টুকরো হয়ে, ছিঁড়বে রাঙা পাগ,
চূর্ণকরা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগলা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে,
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্যসিংহাসনে।
সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়;
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর প্রেমের সবুর সয়।

পূরবী

প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়—
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়,
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন খেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসাদর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জ্বালায় জাগে দানব ভায়া,
গর্জি বলে "আমিই সত্য, দেবতা মিথ্যা মায়া",
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান—
মেশিন গান্-এর সম্মুখে গাই জুঁইফুলের এই গান-

স্বপ্নসম পরবাসে এলি পাশে কোথা হতে তুই,
ও আমার জুঁই।
অজানা ভাষার দেশে
সহসা বলিলি এসে,
"আমারে চেন কি।"
তোর পানে চেয়ে চেয়ে
হৃদয় উঠিল গেয়ে,
"চিনি, চিনি, সখী।"
কত প্রাতে জানায়েছে চিরপরিচিত তোর হাসি,
"আমি ভালোবাসি।"

বিরহব্যথার মতো এলি প্রাণে কোথা হতে তুই,
ও আমার জুঁই।
আজ তাই পড়ে মনে,
বাদলসাঁঝের বনে

পূরবী

ঝর ঝর ধারা,
মাঠে মাঠে ভিজে হাওয়া
যেন কী স্বপনে-পাওয়া
ঘুরে ঘুরে সারা।
সজল তিমিরতলে তোর গন্ধ বলেছে নিশ্বাসি,
"আমি ভালোবাসি।"

মিলনসুখের মতো কোথা হতে এসেছিস তুই,
ও আমার জুঁই।
মনে পড়ে, কত রাতে
দীপ জ্বলে জানালাতে
বাতাসে চঞ্চল ;
মাধুরী ধরে না প্রাণে,
কী বেদনা বক্ষে আনে,
চক্ষে আনে জল।
সে-রাতে তোমার মালা বলেছে মর্মের কাছে আসি,
"আমি ভালোবাসি।"

অসীম কালের যেন দীর্ঘশ্বাস বহেছিস তুই,
ও আমার জুঁই।
বক্ষে এনেছিস কার
যুগযুগান্তের ভার,
ব্যর্থ পথ-চাওয়া,
বারে বারে দ্বারে এসে
কোন্ নীরবের দেশে
ফিরে ফিরে যাওয়া।
তোর মাঝে কেঁদে বাজে চিরপ্রত্যাশার কোন্ বাঁশি,
"আমি ভালোবাসি।"

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বিরহিণী

তিন বছরের বিরহিণী জানলাখানি ধ'রে
কোন্ অলক্ষ্য তারার পানে তাকাও অমন ক'রে।
অতীত কালের বোঝার তলায় আমরা চাপা থাকি,
ভাবী কালের প্রদোষ-আলোয় মগ্ন তোমার আঁখি।
তাই তোমার ঐ কাঁদনহাসির সবটা বুঝি না যে,
স্বপন দেখে অনাগত তোমার প্রাণের মাঝে।
কোন্ সাগরের তীর দেখেছ জানে না তো কেউ,
হাসির আভায় নাচে সে কোন্ সুদূর অশ্রুঢেউ।
সেখানে কোন রাজপুত্তুর চিরদিনের দেশে
তোমার লাগি সাজতে গেছে প্রতিদিনের বেশে।
সেখানে সে বাজায় বাঁশি রূপকথারই ছায়ে,
সেই রাগিণীর তালে তোমার নাচন লাগে গায়ে।
আপনি তুমি জান না তো আছ কাহার আশায়,
অনামারে ডাক দিয়েছ চোখের নীরব ভাষায়।
হয়তো সে কোন্ সকালবেলা শিশিরঝলা পথে
জাগরণের কেতন তুলে আসবে সোনার রথে,
কিম্বা পূর্ণ চাঁদের লগ্নে, বৃহস্পতির দশায়—
দুঃখ আমার, আর সে যে হোক, নয় সে দাদামশায়

বুয়েনোস এয়ারিস
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪

না-পাওয়া

ওগো মোর না-পাওয়া গো, ভোরের অরুণ-আভা-সনে
ঘুমে ছুঁয়ে যাও মোর পাওয়ার পাখিরে ক্ষণে ক্ষণে।
সহসা স্বপন টুটে
তাই সে যে গেয়ে উঠে,
কিছু তার বুঝি নাহি বুঝি।
তাই সে যে পাখা মেলে
উড়ে যায় ঘর ফেলে,
ফিরে আসে কারে খুঁজি খুঁজি।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, সায়াহ্নের করুণ কিরণে
পুরবীতে ডাক দাও আমার পাওয়ারে ক্ষণে ক্ষণে।
হিয়া তাই ওঠে কেঁদে,
রাখিতে পারি না বেঁধে,
অকারণে দূরে থাকে চেয়ে—
মলিন আকাশতলে
যেন কোন্ খেয়া চলে,
কে যে যায় সারিগান গেয়ে।

ওগো মোর না-পাওয়া গো, বসন্তনিশীথ-সমীরণে
অভিসারে আসিতেছ আমার পাওয়ার কুঞ্জবনে।
কে জানালো সে-কথা যে
গোপন হৃদয়-মাঝে,
আজো তাহা বুঝতে পারি নি।
মনে হয়, পলে পলে
দূর পথে বেজে চলে
ঝিল্লিরবে তাহার কিঙ্কিণী।

পূরবী

ওগো মোর না-পাওয়া গো, কখন আসিয়া সংগোপনে
আমার পাওয়ার বীণা কাঁপাও অঙ্গুলিপরশনে।
কার গানে কার সুর
মিলে গেছে সুমধুর
ভাগ ক'রে কে লইবে চিনে।
ওরা এসে বলে, "এ কী,
বুঝাইয়া বলো দেখি।"
আমি বলি, বুঝাতে পারি নে!"

ওগো মোর না-পাওয়া গো, শ্রাবণের অশান্ত পবনে
কদম্ববনের গন্ধে জড়িত বৃষ্টির বরিষণে
আমার পাওয়ার কানে
জানি নে তো মোর গানে
কার কথা বলি আমি কারে।
"কী কহ" সে যবে পুছে
তখন সন্দেহ ঘুচে—
আমার বন্দনা না-পাওয়ারে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

সৃষ্টিকর্তা

জানি আমি, মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি—
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া নিধি।
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী,
সে যে তিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি।
আমি শুনায়েছি তাঁরে, শ্রাবণরাত্রির বৃষ্টিধারা
কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা।
যেদিন পূর্ণিমারাতে পুষ্পিত শালের বনে বনে
শরীরী ছায়ার মতো একা ফিরি আপনার-মনে
গুঞ্জরিয়া অসমাপ্ত সুর, শালের মঞ্জরী যত
কী যেন শুনিতে চাহে ব্যগ্রতায় করি শির নত,
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।
যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহর-মাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে-সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়তিমিরে।

বুয়েনোস এয়ারিস
২৫ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বীণাহারা

যবে এসে নাড়া দিলে দ্বার
চমকি উঠিনু লাজে,
খুঁজে দেখি গৃহ-মাঝে—
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
সেদিন মেঘের ভারে
নদীর পশ্চিম পারে
ঘন হল দিগন্তের ভুরু;
বৃষ্টির-নাচনে-মাতা
বনে মর্মরিল পাতা,
দেয়া গরজিল গুরু গুরু।
ভরা হল আয়োজন,
ভাবিনু ভরিবে মন,
বক্ষে জেগে উঠিবে মল্লার;
হায়, লাগিল না সুর,
কোথায় সে বহুদূর
। ফেলে এসেছি আমার।

কণ্ঠে নিয়ে এলে পুষ্পহার।
পুরস্কার পাব আশে
খুঁজে দেখি চারিপাশে—
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
প্রবাসে বনের ছায়ে
সহসা আমার গায়ে
ফাল্গুনের ছোঁওয়া লাগে একি।

পূরবী

এপারের যত পাখি
সবাই কহিল ডাকি,
“ওপারের গান গাও দেখি।”
ভাবিলাম মোর ছন্দে
মিলাব ফুলের গন্ধে
আনন্দের বসন্তবাহার।
খুঁজিয়া দেখিনু বুকে,
কহিলাম নতমুখে,
“বীণা ফেলে এসেছি আমার।”

এল বুঝি মিলনের বার;
আকাশ ভরিল ওই,
শুধাইলে “সুর কই”।
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
অস্তরবি গোধূলিতে
বলে গেল পূরবীতে
আর তো অধিক নাই দেরি।
রাঙা আলোকের জবা
সাজিয়ে তুলেছে সভা,
সিংহদ্বারে বাজিয়াছে ভেরি।
সুদূর আকাশতলে
ধ্রুবতারা ডেকে বলে,
“তারে তারে লাগাও ঝংকার।”
কানাড়াতে শাহানাতে
জাগিতে হবে যে রাতে—
বীণা ফেলে এসেছি আমার।

এলে নিয়ে শিখা বেদনার।
গানে যে বরিব তারে
চাহিলাম চারিধারে—
বীণা ফেলে এসেছি আমার,
ওগো বীনকার।
কাজ হয়ে গেছে সারা,
নিশীথে উঠেছে তারা,
মিলে গেছে বাটে আর মাঠে।
দীপহীন বাঁধা তরী
সারা দীর্ঘ রাত ধরি
ঢুলিয়া ঢুলিয়া ওঠে ঘাটে।
যে-শিখা গিয়েছে নিবে
অগ্নি দিয়ে জ্বেলে দিবে,
সে-আলোতে হতে হবে পার।
শুনেছি গানের তালে
সুবাতাস লাগে পালে—
বীনা ফেলে এসেছি আমার।

সান ইসিড্রো
২৭ ডিসেম্বর, ১৯২৪

বনস্পতি

পূর্ণতার সাধনায় বনস্পতি চাহে ঊর্ধ্ব-পানে ;
পুঞ্জ পুঞ্জ পল্লবে পল্লবে
নিত্য তার সাড়া জাগে বিরাটের নিঃশব্দ আহ্বানে,
মন্ত্র জপে মর্মরিত রবে।
ধ্রুবত্বের মূর্তি সে যে, দৃঢ়তা শাখায় প্রশাখায়,
বিপুল প্রাণের বহে ভার।
তবু তার শ্যামলতা কম্পমান ভীরু বেদনায়
আন্দোলিয়া উঠে বারম্বার।

দয়া কোরো, দয়া কোরো আরণ্যক এই তপস্বীরে,
ধৈর্য ধরো, ওগো দিগঙ্গনা—
ব্যর্থ করিবারে তায় অশান্ত আবেগে ফিরে ফিরে
বনের অঙ্গনে মাতিয়ো না।
এ কী তীব্র প্রেম, এ যে শিলাবৃষ্টি নির্মম দুঃসহ—
দুরন্ত চুম্বনবেগে তব
ছিঁড়িতে ঝরাতে চাও অন্ধ সুখে, কহো মোরে কহো,
কিশোর কোরক নব নব ?

অকস্মাৎ দস্যুতায় তারে রিক্ত করি নিতে চাও
সর্বস্ব তাহার তব সাথে ?
ছিন্ন করি লবে যাহা চিহ্ন তার রবে না কোথাও,
হবে তারে মুহূর্তে হারাতে।
যে লুব্ধ ধূলির তলে লুকাতে চাহিবে তব লাভ
সে তোমারে ফাঁকি দেবে শেষে।
লুণ্ঠনের ধন লুঠি সর্বগ্রাসী দারুণ অভাব
উঠিবে কঠিন হাসি হেসে।

আসুক তোমার প্রেম দীপ্তিরূপে নীলাম্বরতলে,
শান্তিরূপে এসো, দিগঙ্গনা।
উঠুক স্পন্দিত হয়ে শাখে শাখে পল্লবে বল্কলে
সুগম্ভীর তোমার বন্দনা।
দাও তারে সেই তেজ মহত্ত্বে যাহার সমাধান,
সার্থক হোক সে বনস্পতি।
বিশ্বের অঞ্জলি যেন ভরিয়া করিতে পারে দান
তপস্যার পূর্ণ পরিণতি।

উঠুক তোমার প্রেম রূপ ধরি তার সর্ব-মাঝে
নিত্য নব পত্রে ফলে ফুলে।
গোপনে আঁধারে তার যে-অনন্ত নিয়ত বিরাজে
আবরণ দাও তার খুলে।
তাহার গৌরবে লহো তোমারি স্পর্শের পরিচয়,
আপনার চরম বারতা।
তারি লাভে লাভ করো বিনা লোভে সম্পদ অক্ষয়,
তারি ফলে তব সফলতা।

সান ইসিড্রো
২৮ ডিসেম্বর, ১৯২৪

পথ

আমি পথ, দূরে দূরে দেশে দেশে ফিরে ফিরে শেষে
দুয়ার-বাহিরে থামি এসে।
ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার ধারা—
আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তারি ছিন্ন অংশ অর্থহারা,
সেথা হতে লেগে মোর ধূলিপটে দীপরশ্মিরেখা
অসম্পূর্ণ লেখা।

জীবনের সৌধ-মাঝে কত কক্ষ, কত-না মহলা,
তলার উপরে কত তলা।
আজন্মবিধবা তারি এক প্রান্তে রয়েছি একাকী,
সবার নিকটে থেকে তবুও অসীম-দূরে থাকি ;
লক্ষ্য নহি উপলক্ষ্য, দেশ নহি আমি যে উদ্দেশ,
মোর নাহি শেষ।

উৎসবসভায় যেতে যে পায় আহ্বানপত্রখানি
তাহারে বহন করে আনি।
সে-লিপির খণ্ডগুলি মোর বক্ষে উড়ে এসে পড়ে,
ধুলায় করিয়া লুপ্ত তাদের উড়ায়ে দিই ঝড়ে,
আমি মালা গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর
বহু বিস্মৃতির।

কেহ যারে নাহি শোনে, সবাই যাহারে বলে "জানি",
আমি সেই পুরাতন বাণী।
বণিকের পণ্যযান, হে তুমি রাজার জয়রথ,
আমি চলিবার পথ, সেই আমি ভুলিবার পথ ;
তীব্র দুঃখ, মহা দম্ভ, চিহ্ন মুছে গিয়েছে সবাই—
কিছু নাই, নাই।

কভু সুখে, কভু দুঃখে নিয়ে চলি ; সুদিন দুর্দিন
নাহি বুঝি আমি উদাসীন।
বারবার কচি ঘাস কোথা হতে আসে মোর কোলে,
চলে যায়— সেও যায় যে যায় তাহারে দ'লে দ'লে ;
বিচিত্রের প্রয়োজনে অবিচিত্র আমি শূন্যময়,
কিছু নাহি রয়।

বসিতে না চাহে কেহ, কাহারো কিছু না সহে দেরি,
কারো নই তাই সকলেরি।
বামে মোর শস্যক্ষেত্র, দক্ষিণে আমার লোকালয়—
প্রাণ সেথা দুই হস্তে বর্তমান আঁকড়িয়া রয়।
আমি সর্ববন্ধহীন নিত্য চলি তারি মধ্যখানে
ভবিষ্যের পানে।

তাই আমি চিররিক্ত, কিছু নাহি থাকে মোর পুঁজি—
কিছু নাহি পাই, নাহি খুঁজি।
আমারে ভুলিবে ব'লে যাত্রীদল গান গাহে সুরে—
পারি নে রাখিতে তাহা, সে-গান চলিয়া যায় দূরে।
বসন্ত আমার বুকে আসে যবে ধুলায় আকুল
নাহি দেয় ফুল।

পৌঁছিয়া ক্ষতির প্রান্তে বিত্তহীন একদিন শেষে
শয্যা পাতে মোর পাশে এসে।
পান্থের পাথেয় হতে খসে পড়ে যাহা ভাঙাচোরা
ধূলিরে বঞ্চনা করি কাড়িয়া তুলিয়া লয় ওরা ;
আমি রিক্ত, ওরা রিক্ত, মোর 'পরে নাই প্রীতিলেশ—
মোরে করে দ্বেষ।

শুধু শিশু বোঝে মোরে ; আমারে সে জানে ছুটি ব'লে,
ঘর ছেড়ে আসে তাই চলে।
নিষেধ বা অনুমতি মোর মাঝে না দেয় পাহারা,
আবশ্যকে নাহি রচে বিবিধের বস্তুময় কারা,
বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে—
শিশু বোঝে মোরে।

বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খুশি সৃষ্টি করে তাই,
এই আছে এই তাহা নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা,
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙাগড়া দুই নিয়ে নৃত্য তার অখণ্ড উল্লাসে—
মোরে ভালোবাসে।

সান ইসিড্রো
২৯ নভেম্বর, ১৯২৪

মিলন

জীবনমরণের স্রোতের ধারা
যেখানে এসে গেছে থামি
সেখানে মিলেছিনু সময়হারা
একদা তুমি আর আমি।
চলেছি আজ একা ভেসে
কোথা যে কত দূর দেশে,
তরণী ছুলিতেছে ঝড়ে—
এখন কেন মনে পড়ে,
যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

সেখানে বসেছিনু আপনাভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
ছুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুশি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,
কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হল তারাময়,
প্রাণের নিশ্বাস কী মহাবেগে
ছুটেছে দশদিক্‌গামী—
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি।

বিজনে বসেছিনু আকাশ চাহি
তোমার হাত নিয়ে হাতে।
দোঁহার কারো মুখে কথাটি নাহি,
নিমেষ নাহি আঁখিপাতে।
সেদিন বুঝেছিনু প্রাণে
ভাষার সীমা কোন্‌খানে,
বিশ্বহৃদয়ের মাঝে
বাণীর বীণা কোথা বাজে,
কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফুটে দিনযামী—
বুঝিনু যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু তুমি আর আমি।

বুঝিনু কী আগুনে ফাগুনহাওয়া
গোপনে আপনারে দাহে,
কেন-যে অরুণের করুণ চাওয়া
নিজের মিলাইতে চাহে,
অকূলে হারাইতে নদী
কেন যে ধায় নিরবধি,
বিজুলি আপনার বাণে
কেন যে আপনারে হানে,
রজনী কী খেলা যে প্রভাত-সনে
খেলিছে পরাজয়কামী—
বুঝিনু যবে দোঁহে পরানপণে
খেলিনু তুমি আর আমি।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
৯ জানুয়ারি, ১৯২৫

অন্ধকার

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।
প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুভ্র তব আদি শঙ্খধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিল, একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি ;
সে তব সংকেতমন্ত্র ধ্বনিয়াছে, হে মৌনী মহান,
কর্মের তরঙ্গে মোর ; স্বপ্ন-উৎস হতে মোর গান
উঠেছে ব্যাকুলি।

নিস্তব্ধের সে আহ্বানে বাহিয়া জীবনযাত্রা মম
সিন্ধুগামী তরঙ্গিণীসম
এতকাল চলেছিনু তোমারি সুদূর অভিসারে
বঙ্কিম জটিল পথে সুখে-দুঃখে-বন্ধুর সংসারে
অনির্দেশ অলক্ষ্যের পানে।
কভু পথতরুচ্ছায়ে খেলাঘর করেছি রচনা,
শেষ না হইতে খেলা চলিয়া এসেছি অন্যমনা
অশেষের টানে।

আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।
যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে "দ্বার খোলো"।

পূরবী

দিনের আড়ালে থেকে কী চেয়েছি পাই নি উদ্দেশ,
আজ সে-সন্ধান হোক শেষ।
হে চিরনির্মল, তব শান্তি দিয়ে স্পর্শ করো চোখ,
দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হোক
আঁধারের আলোকভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সংগীত তোমার।

দিনের সংগ্রহ হতে আজি কোন্ অর্ঘ্য নিয়ে যাই
তোমার মন্দিরে, ভাবি তাই।
কত না শ্রেষ্ঠীর হাতে পেয়েছি কীর্তির পুরস্কার,
সযত্নে এসেছি বহে সেই সব রত্ন-অলংকার,
ফিরিয়াছি দেশ হতে দেশে।
শেষে আজ চেয়ে দেখি, যবে মোর যাত্রা হল সারা
দিনের আলোর সাথে ম্লান হয়ে এসেছে তাহারা
তব দ্বারে এসে।

রাত্রির নিকষে হায় কত সোনা হয়ে যায় মিছে,
সে-বোঝা ফেলিয়া যাব পিছে।
কিছু বাকি আছে তবু, প্রাতে মোর যাত্রাসহচরী
অকারণে দিয়েছিল মোর হাতে মাধবীমঞ্জরী,
আজো তাহা অম্লান বিরাজে।
শিশিরের ছোঁয়া যেন এখনো রয়েছে তার গায়,
এ জন্মের সেই দান রেখে দেব তোমার থালায়
নক্ষত্রের মাঝে।

হে নিত্য নবীন, কবে তোমারি গোপন কক্ষ হতে
পাড়ি দিল এ ফুল আলোতে।
সুপ্তি হতে জেগে দেখি, বসন্তে একদা রাত্রিশেষে
অরুণকিরণ-সাথে এ মাধুরী আসিয়াছে ভেসে
হৃদয়ের বিজন পুলিনে।
দিবসের ধুলা এরে কিছুতে পারে নি কাড়িবারে,
সেই তব নিজ দান বহিয়া আনিনু তব দ্বারে—
তুমি লও চিনে।

হে চরম, এরি গন্ধে তোমারি আনন্দ এল মিশে,
বুঝেও তখন বুঝি নি সে।
তব লিপি বর্ণে বর্ণে লেখা ছিল এরি পাতে পাতে,
তাই নিয়ে গোপনে সে এসেছিল তোমারে চিনাতে,
কিছু যেন জেনেছি আভাসে।
আজিকে সন্ধ্যায় যবে সব শব্দ হল অবসান
আমার ধেয়ান হতে জাগিয়া উঠিছে এরি গান
তোমার আকাশে।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১০ জানুয়ারি, ১৯২৫

প্রাণগঙ্গা

প্রতিদিন নদীস্রোতে পুষ্পপত্র করি অর্ঘ্য দান
পূজারির পূজা-অবসান।
আমিও তেমনি যত্নে মোর ডালি ভরি
গানের অঞ্জলি দান করি
প্রাণের জাহ্নবীজলধারে,
পূজি আমি তারে।

বিগলিত প্রেমের আনন্দবারি সে যে,
এসেছে বৈকুণ্ঠধাম ত্যেজে।
মৃত্যুঞ্জয় শিবের অসীম জটাজালে
ঘুরে ঘুরে কালে কালে
তপস্যার তাপ লেগে প্রবাহ পবিত্র হল তার।
কত-না যুগের পাপভার
নিঃশেষে ভাসায়ে দিল অতলের মাঝে।
তরঙ্গে তরঙ্গে তার বাজে
ভবিষ্যের মঙ্গলসংগীত।
তটে তটে বাঁকে বাঁকে অনন্তের চলেছে ইঙ্গিত।

দৈবস্পর্শে তার
আমারে সে ধূলি হতে করিল উদ্ধার ;
অঙ্গে অঙ্গে দিল তার তরঙ্গের দোল ;
কণ্ঠে দিল আপন কল্লোল।
আলোকের নৃত্যে মোর চক্ষু দিল ভরি
বর্ণের লহরী।

খুলে গেল অনন্তের কালো উত্তরীয়,
কতরূপে দেখা দিল প্রিয়,
অনির্বচনীয়।

তাই মোর গান
কুসুম-অঞ্জলি-অর্ঘ্যদান
প্রাণজাহ্নবীরে।
তাহারি আবর্তে ফিরে ফিরে
এ পূজার কোনো ফুল নাও যদি ভাসে চিরদিন,
বিস্মৃতির তলে হয় লীন,
তবে তার লাগি, কহো,
কার সাথে আমার কলহ।
এই নীলাম্বরতলে তৃণরোমাঞ্চিত ধরণীতে
বসন্তে বর্ষায় গ্রীষ্মে শীতে
প্রতিদিবসের পূজা প্রতিদিন করি অবসান
ধন্য হয়ে ভেসে যাক্ গান।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৬ জানুয়ারি, ১৯২৫

বদল

হাসির কুসুম আনিল সে ডালি ভরি,
আমি আনিলাম দুখবাদলের ফল।
শুধালেম তারে, "যদি এ বদল করি
হার হবে কার বল্।"
হাসি কৌতুকে কহিল সে সুন্দরী,
"এসো-না, বদল করি।
দিয়ে মোর হার লব ফলভার
অশ্রুর রসে ভরা।"
চাহিয়া দেখিনু মুখ-পানে তার
নিদয়া সে মনোহরা।

সে লইল তুলে আমার ফলের ডালা,
করতালি দিল হাসিয়া সকৌতুকে।
আমি লইলাম তাহার ফুলের মালা,
তুলিয়া ধরিনু বুকে।
"মোর হল জয়" হেসে হেসে কয়,
দূরে চলে গেল ত্বরা।
উঠিল তপন মধ্যগগনদেশে,
আসিল দারুণ খরা;
সন্ধ্যায় দেখি তপ্তদিনের শেষে,
ফুলগুলি সব ঝরা।

জুলিয়ো চেজারে জাহাজ
১৭ জানুয়ারি, ১৯২৫

ইটালিয়া

কহিলাম, "ওগো রানী,
কত কবি এল, চরণে তোমার উপহার দিল আনি।
এসেছি শুনিয়া তাই,
উষার দুয়ারে পাখির মতন গান গেয়ে চলে যাই।"
শুনিয়া দাঁড়ালে তব বাতায়ন-'পরে,
ঘোমটা-আড়ালে কহিলে করুণ স্বরে,
"এখন শীতের দিন
কুয়াশায় ঢাকা আকাশ আমার, কানন কুসুমহীন।"

কহিলাম, "ওগো রানী,
সাগরপারের নিকুঞ্জ হতে এনেছি বাঁশরিখানি।
উতারো ঘোমটা তব,
বারেক তোমার কালো নয়নের আলোখানি দেখে লব।"
কহিলে, "আমার হয় নি রঙিন সাজ,
হে অধীর কবি, ফিরে যাও তুমি আজ;
মধুর ফাগুন মাসে
কুসুম-আসনে বসিব যখন ডেকে লব মোর পাশে।"

কহিলাম, "ওগো রানী,
সফল হয়েছে যাত্রা আমার, শুনেছি আশার বাণী।
বসন্তসমীরণে
তব আহ্বানমন্ত্র ফুটিবে কুসুমে আমার বনে।

মধুপমুখর গন্ধমাতাল দিনে
ওই জানালায় পথখানি লব চিনে,
আসিবে সে সুসময়।
আজিকে বিদায় নেবার বেলায় গাহিব তোমার জয়।'

মিলান
২৪ জানুয়ারি, ১৯২৫

গ্রন্থপরিচয়

পূরবী দুই অংশে বিভক্ত। ১৩২৪-১৩৩০ সালে লিখিত কবিতাগুলি 'পূরবী' অংশে, ১৩৩১ সালে দক্ষিণ-আমেরিকায় ও য়ুরোপে ভ্রমণকালে লিখিত কবিতাগুলি 'পথিক' অংশে মুদ্রিত হইয়াছে। পূরবীর প্রথম প্রকাশকালে ইহার অতিরিক্ত 'সঞ্চিতা'-শীর্ষক তৃতীয়ভাগে ইতিপূর্বে-গ্রন্থাকারে-অপ্রকাশিত অন্য একাদশটি কবিতা পুরাতন পাণ্ডুলিপি বা সাময়িক পত্রিকা হইতে সংকলিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় মুদ্রণ বা সংস্করণ-সময়ে সেগুলি পূরবী হইতে বর্জিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, শিবাজি-উৎসব, নমস্কার, সুপ্রভাত, কবিতা, তিনটি সঞ্চয়িতায় সংকলিত রহিয়াছে; পত্র কবিতাটি প্রহাসিনীর যন্ত্রস্থ নূতন সংস্করণে পাওয়া যাইবে; দুর্দিন কবিতা এ পর্যন্ত অন্য কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয় নাই; অবশিষ্ট ছয়টি কবিতা রবীন্দ্ররচনাবলীর দশম খণ্ডে উৎসর্গের সংযোজনরূপে মুদ্রিত আছে এবং উৎসর্গের প্রচলিত (১৩৫১ ফাল্গুন) সংস্করণেও গৃহীত হইয়াছে।

১৩৩১ সালে পশ্চিমযাত্রার পথে কবি যে দিনলিপি লিপিবদ্ধ করেন তাহা 'যাত্রী' গ্রন্থের 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি'-শীর্ষক অধ্যায়ে মুদ্রিত আছে। ইহাতে পূরবীর ঐ সময়ের কবিতাবলীর কবির স্বকৃত অনেক ব্যাখ্যা ও আভ্যন্তরিক ইতিহাস পাওয়া যায়। প্রবাসী পত্রিকায় (১৩৩১-৩২) প্রকাশকালে 'যাত্রারম্ভ' ও 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি' রচনাধারার অন্তর্ভুক্ত করিয়াই পূরবীর 'পথিক' অংশের অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো কবিতার প্রবাসীতে মুদ্রিত পাঠ হইতে পূরবীতে সংকলিত পাঠ ভিন্ন। ১৩৩১ দ্বিতীয় খণ্ড ও ১৩৩২ প্রথম খণ্ডের প্রবাসী অথবা চতুর্দশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রন্থপরিচয় দেখিলে, এ বিষয়ের বিশদ তথ্য জানা যাইবে। পূরবীর 'না-পাওয়া' (পৃ ১৭০-১৭১) কবিতার আদ্যোপান্ত পৃথক ছন্দে রচিত একটি পাঠ ১৩৩২ বৈশাখের প্রবাসী হইতে উদ্‌ধৃত হইল।

ওগো আমার না-পাওয়া গো, অরুণ-আভা তুমি,
আঁধার-তীরে স্বপনকে মোর কখন যে যাও চুমি।
পাওয়া আমার নীড়ের পাখি
আধেক ঘুমে ওঠে ডাকি
তোমার ছোঁয়ায় বুঝি!
লক্ষ্যহারা ডানা মেলে
যায় সে উড়ে কুলায় ফেলে,
অকারণে ফেরে আকাশ খুঁজি।

ওগো আমার না-পাওয়া গো, সন্ধ্যামেঘের ফাঁকে
পাওয়ারে মোর ডাক' তুমি করুণ আলোর ডাকে।
তাই সে হঠাৎ ওঠে কেঁদে,
পারি নে তায় রাখতে বেঁধে,
দূর-পানে রয় চেয়ে।
শোনে বুঝি আকাশতলে
পারের খেয়া ভেসে চলে,
সারিগানের ধুয়ো কে যায় গেয়ে॥

ওগো আমার না-পাওয়া গো, কখন অন্ধকারে
লুকিয়ে এসে আঘাত কর' পাওয়ার বীনার তারে।
কাহার সুরে কাহার গানে
যায় মিশে যে তালে তানে,
ভাগ করা নয় সোজা;
সবাই যখন অর্থ খোঁজে,
বলে "বোঝাও কী হল যে",
আমি বলি, "কিছু না যায় বোঝা।"

ওগো আমার না-পাওয়া গো, সজল সমীরণে
কদম্বরেণুর গন্ধে মেশা বাদল-বরিষনে
আমার পাওয়ার কানে কানে
মনের কথা বলি গানে,
সে শুনে কয়, "একি !"
কী জানি গো কিসের ঘোরে
তারে শোনাই কিম্বা তোরে
বুঝতে নারি যখন ভেবে দেখি

বুয়েনোস্ আইরেস্
২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৪

'আন্মনা' (পৃ ৮৪) এবং 'বদল' (পৃ ১৮৮) কবিতা দুটির কিছু-কিছু পরিবর্তন করিয়া কবি তাহাতে সুরসংযোগ করেন। সেই পাঠান্তর প্রচলিত গীতবিতান গ্রন্থের 'প্রেম'-শীর্ষক অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত আছে—

আন্মনা, আন্মনা ইত্যাদি।
তার হাতে ছিল হাসির ফুলের হার ইত্যাদি।

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী, [illegible] দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ

ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ২১১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা